Approved as a Text-Book for Class VII of H. E. Schools in Bengal.
(Vide Calcutta Gazette, 13th Nov., 1930)

সাহিত্য

সৌরভ

পঞ্চম ভাগ

Approved by the Director of Public Instruction, Bengal, as a Text-Book for Class VII of H. E. Schools in Bengal.
(Vide Calcutta Gazette, 13th Nov., 1930)

সাহিত্য-সৌরভ

পঞ্চম ভাগ

শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক
ও
"প্রাকৃতিকী" "বৈজ্ঞানিকী" "গ্রহনক্ষত্র" "গাছপালা"
"পোকামাকড়" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়

প্রণীত

মূল্য ॥৵০ নয় আনা

প্রকাশক
শ্রীআশুতোষ ধর
আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
ঢাকা ও চট্টগ্রাম

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৩৩৭

কলিকাতা
৫নং কলেজ স্কোয়ার,
শ্রীনারসিংহ প্রেসে
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

নক্ষত্র-মণ্ডল

সাহিত্য-সৌরভ

পঞ্চম ভাগ

গদ্যাংশ

কবীর

প্রায় চারিশত বৎসর আগেকার কথা বলিতেছি। নিঃসন্তান জোলা নীরুর গৃহে তাহার পত্নী নীমার কোল উজ্জ্বল করিয়া এক শিশু আসিল; কেহ বলে সে শিশু নীমারই গর্ভে জন্মিয়াছিল, কেহ বলে নীমা তাহাকে কুড়াইয়া পাইয়াছিল।

কাশী হইতে কিছু দূরে "লহরতালাও" নামে এক প্রকাণ্ড সরোবর; তাহারই পাশ দিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে। সরোবরে হাজার হাজার রক্তপদ্ম, শ্বেতপদ্ম ফুটিয়া পথ গন্ধে ভরিয়া রাখে। শ্রান্ত পথিক পথপার্শ্বের আম্র বট এবং অশ্বত্থের ছায়ায় বিশ্রামের জন্য দাঁড়াইয়া এই অপরূপ শোভা দেখে।

প্রবাদ এই যে, একদিন দরিদ্র জোলা নীরু শ্বশুরবাড়ী হইতে তাহার স্ত্রী নীমাকে লইয়া কাশীতে তাহাদের বাড়ীতে ফিরিতেছিল। পথের ক্লান্তিতে রৌদ্রের প্রখর তাপে নীমার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; পথের ধারে একটি প্রাচীন বটগাছ তাহার বিরাট্ শাখা-বাহু বিস্তার করিয়া তরুতল ছায়াশীতল করিয়া রাখিয়াছিল। নীরু নীমাকে লইয়া সেই ছায়ায় বিশ্রাম করিবার জন্য আসিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ নীরু নীমাকে বলিল—"দেখ, দেখ,—কি আশ্চর্য্য! একটি ননীর মত শুভ্র শিশু পদ্মের শতদলের উপর শুইয়া রহিয়াছে!" নীমা ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া লইল। নীমার সন্তান হয় নাই; শিশুকে কোলে লইয়া তাহার বুক জুড়াইয়া গেল; মাতৃ-স্নেহ জাগিয়া উঠিল। তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া স্থির করিল যে, তাহারা শিশুকে লইয়া যাইবে।

কাশীর এক প্রান্তে মুসলমান পল্লীতে তাহাদের জীর্ণ কুটীর। সেইখানে নীরু ও নীমা বাস করে; নীরু তাঁত বোনে, নীমা সূতা ঠিক করিয়া দেয়। তাহারা শিশুকে লইয়া গৃহে ফিরিল; দরিদ্র জোলার শূন্য ঘর পূর্ণ হইল; তাহাদের কুটীর শিশুর কলরোলে মুখরিত হইয়া উঠিল। নীমা আপন স্তন-দুগ্ধে শিশুকে মানুষ করিতে লাগিল। মৌলভীকে ডাকিয়া আনিয়া পিতামাতা শিশুর নামকরণ করিল "কবীর" মুসলমানশাস্ত্রে 'কবীর' ভগবানেরই নাম।

কবীর
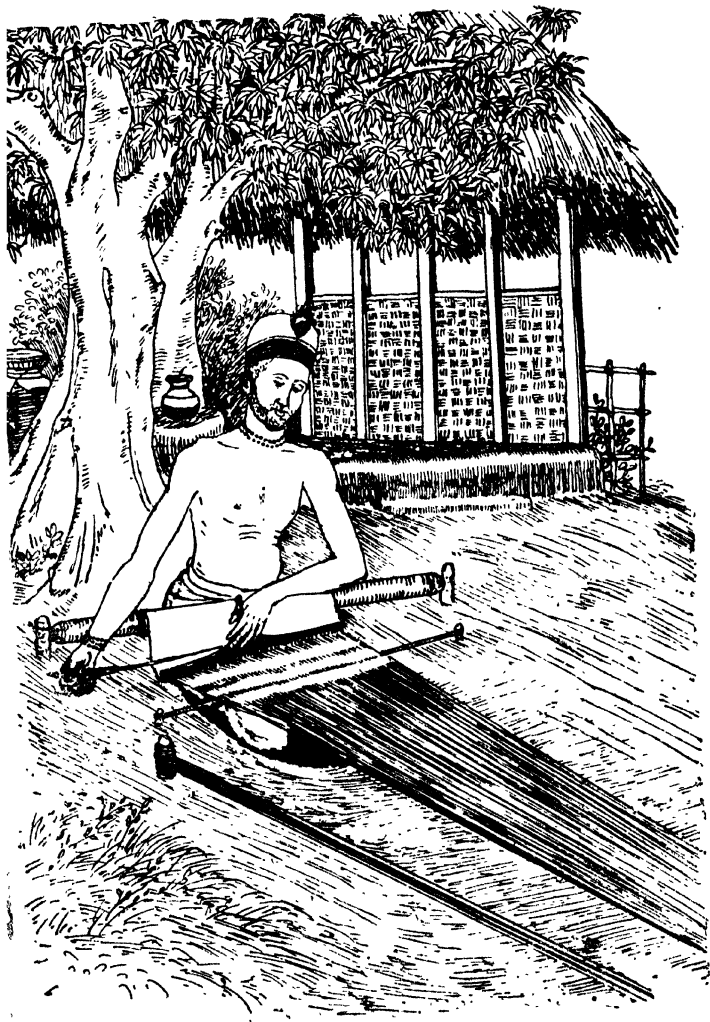
সেকেন্দর লোদী তখন দিল্লীর পাঠান বাদশাহ, মুসলমানদের তখন প্রভুত্বের দিন। হিন্দুরা ভয়ে তাহাদের সঙ্গে একত্রে বাস করিত বটে, কিন্তু দুই দলের মধ্যে মনের মিল ছিল না। দুই ধর্ম্মে সর্ব্বদাই বিরোধ বাধিত। হজরত মহম্মদ আটশত বৎসর পূর্ব্বে আরবে যে বিশুদ্ধ ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, এতদিনে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল; অনেক কিছু অন্যায় সংস্কার তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মেরও তখন অবনতির যুগ। জাতিভেদ, ছুৎমার্গ প্রভৃতি নানা সংস্কারে হিন্দুদের অত্যন্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছিল; এক জাতির সহিত অন্য জাতির, এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের মিল ছিল না। সকল মানুষের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া বড় হইয়া উঠিয়াছিল হিন্দুদের প্রস্তরের প্রাণহীন প্রতিমাগুলি। সকল মানুষকেই সৃষ্টি করিয়া ভগবান যে ব্রাহ্মণচণ্ডাল সকলকেই সমান করিয়াছেন, একথা সেদিন মানুষ ভুলিতে বসিয়াছিল। ধর্ম্ম সেদিন শুধু উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দেশের যে নিরক্ষর দীনদরিদ্র লোকগুলি অত্যন্ত সরলও শান্ত জীবন যাপন করে, তাহারা এই উচ্চবর্ণের অন্যায় অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া মুক্তির সন্ধান করিতেছিল।

এমন সময়ে একজন মহাপুরুষ আসিলেন, তাঁহার নাম রামানন্দ। তিনি ছিলেন রামানুজী সম্প্রদায়ের একজন গুরু; সে সম্প্রদায়ের শুচিতাবিচার, জাতিবোধ অতি ভয়ানক

ছিল ; একজন অপরজনের খাওয়া দেখিলে সে অন্ন অপবিত্র হইয়া যাইত—এমনই ছিল তাহাদের আচারের নাগপাশ! রামানন্দ সেই সম্প্রদায়ের লোক হইয়াও কেমন করিয়া সকল সংস্কারের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যজনক। তিনি প্রচার করিলেন—ধর্ম্মে ব্রাহ্মণচণ্ডাল সকলেরই সমান অধিকার ; শুধু শুষ্ক আচারই মানুষকে মুক্তি দেয় না, তাহার জন্য পবিত্র মন, ভক্তি ও প্রেম চাই ; ভগবানকে প্রেমের নৈবেদ্য দিতে হইবে।

এই রামানন্দই নাকি কবীরের গুরু ছিলেন। কবীরের গুরুবরণের কাহিনী সুন্দর ; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তাঁহার বাল্যজীবনের কথা কিছু বলা প্রয়োজন।

শুনা যায়, অতি বাল্যকালেই কবীরের জীবনে ধর্ম্মভাব বিকশিত হইয়াছিল। প্রহ্লাদের মতই তিনিও নাকি তাঁহার মৌলভীকে তত্ত্বজ্ঞান দিয়া অবাক্ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরিবারের সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন তাঁহার হিন্দুভাবের জন্য। কিশোর কবীর তিলক কাটে, রাম নাম করে, হিন্দু সাধুসন্ন্যাসীর সন্ধানে কাশীর গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায়, ভজনকীর্ত্তন শুনিয়া তাহার প্রহরের পর প্রহর কাটিয়া যায়, আহার নিদ্রা বিশ্রাম ঘুচিয়া যায়। মুসলমানের গৃহে একি অনাচার! কবীরের আত্মীয়, স্বজন, হিতকামী বন্ধু সকলেই আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কবীরের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ

নাই ; তিনি শুধু হাসেন এবং বলেন, "হিন্দুর রাম, মুসলমানের আল্লা, দুইই ত' এক, তবে কেন বৃথা দ্বন্দ্ব কর।"

ব্রাহ্মণেরাও মুসলমান-সন্তানের এই অনাচারে বিরক্ত হইয়া উঠিল। কবীর তাহাতে বিচলিত না হইয়া বলিলেন, "যদি অন্তরে প্রেম না থাকে, তবে যাগ যজ্ঞ সবই ব্যর্থ হইয়া যায়।"

তখন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই কবীরের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল ; কিন্তু তাঁহার অটল ধর্ম্ম-বিশ্বাসের নিকটে উভয়কেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। তাঁহার জীবনযাত্রার কোন পরিবর্ত্তনই হইল না। তিনি পূর্ব্বেরই মত তাঁত বোনেন, সাধুসন্তদের সেবা করেন, আর আপন মনে ভগবানের ধ্যানে দিন যাপন করেন। কিন্তু তাঁহার ব্যবসায়ের অবস্থা ক্রমশঃই মন্দ হইতে লাগিল। পূর্ব্বেই নীরুর মৃত্যু হইয়াছিল ; সংসারের ভার কবীরের উপরই পড়িল। নীমা সংসারের দুরবস্থা, পুত্রের ঔদাসীন্য দেখিয়া কাঁদিয়া আসিয়া বলিলেন, "এমন করিয়া কি চলে ?" কবীর তাঁহাকে উত্তর দিলেন "ভয় কি মা ? যিনি যুগে যুগে মানুষের দুঃখ ঘুচাইয়া আসিয়াছেন, তিনিই আমাদের দুঃখ ঘুচাইবেন।" কবীরের মন ক্রমেই সংসার হইতে দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। গল্প আছে, তাঁহাদের সেই সংসারের অনটনের দিনে ভগবান এক বণিকের হাত দিয়া তাঁহাদের অন্নের অভাব দূর করেন।

কবীরকে লজ্জা দিবার জন্য একবার কাশীর ব্রাহ্মণেরা অনেকে আসিয়া তাঁহার কাছে ভিক্ষা চহিল। নিঃস্ব কবীরের দান করিবার মত কোন সম্পদই ছিল না; তিনি কি দিবেন? তখন তাঁহার কয়েকজন ধনী ভক্ত, ব্রাহ্মণদের প্রচুর ধন দিয়া বিদায় করিলেন। কবীরের এই দানের কথা, তাঁহার সাধুতার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তখন দলে দলে তাঁহার কাছে লোক আসিতে লাগিল; কেহ চায় অর্থ, কেহ পুত্র কামনা করে, কেহ আরোগ্য ভিক্ষা করে, কেহ বা শুধু তাঁহার আশীর্ব্বাদই চায়।

দরিদ্র জোলার জীর্ণ কুটীর তীর্থে পরিণত হইল; কবীরের শান্ত-শুদ্ধ জীবনে বাধা পড়িল। তিনি খ্যাতি কামনা করেন নাই; তিনি চাহিয়াছিলেন ভগবানকে; কিন্তু এখন ভগবান বিশ্বশুদ্ধ সকলকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া নিজে কি সেই জনতার আড়ালে দূরে সরিয়া যাইবেন? এই বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য কবীর এক অভিনব পন্থা স্থির করিলেন। তিনি এমন একটি কাজ করিলেন যে, সকলেই তাঁহাকে "ছি" "ছি" করিতে লাগিল; চারিদিকে তাঁহার নিন্দা ছড়াইয়া পড়িল। ইন্দ্রজালের মত এক মুহূর্ত্তে যাত্রীর ভিড় কোথায় মিশাইয়া গেল? কবীর পরমানন্দে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "আমি ত ইহাই চাহিয়া-ছিলাম; যখন সকলে আমায় ত্যাগ করিবে, তখন সেই নিভৃতে তোমার আমার মিলন হইবে।"

শুনা যায়, এই সময়ে মুসলমানদের প্ররোচনায় বাদশাহ সেকেন্দর লোদী তাঁহার প্রতি অনেক অত্যাচার করেন; কিন্তু অবশেষে তিনিও কবীরের সাধুতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মুক্তি দেন। তিনি তাঁহাকে অনেক ধনরত্ন দিতে চাহিলে কবীর বলেন, "আমার ধন প্রেম, তোমার এ ধন লইয়া আমার কি হইবে?" নিঃস্ব কবীর বাদশাহের অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার জীর্ণ কুটীরে ফিরিয়া গেলেন।

কথিত আছে, যৌবনে কবীর রামানন্দের নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। তিনি যে সত্যই রামানন্দের শিষ্য ছিলেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না—তবে ইহা সত্য যে, তিনি রামানন্দের সাধনার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। রামানন্দের নিকটে কবীরের দীক্ষা গ্রহণ-সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে।

যখন কবীরের ধর্ম্মবিশ্বাসের নিকট হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই হার মানিল, তখন তাহারা প্রচার করিয়া দিল, কবীর "নিগুরা," অর্থাৎ তাঁহার কোন গুরু নাই। সুতরাং তাঁহার কাহাকেও উপদেশ দিবার অধিকার নাই। 'নিগুরা' হওয়া তখন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই অত্যন্ত নিন্দার বিষয় ছিল। কবীর বলিলেন, "বেশ, আমি গুরুর নিকট দীক্ষা লইব।"

বিকশিত শতদলের সৌরভে যেমন ভ্রমর আকৃষ্ট হয়, তেমনই অনেক দিন হইতেই কবীরের মন রামানন্দের

প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল কিন্তু তিনি ভাবিয়াছিলেন, "আমি মুসলমান, তিনি হিন্দু সাধু; তিনি কি জাতিবিচারের কঠিন বাধা উত্তীর্ণ হইয়া আমাকে তাঁহার সাধনায় দীক্ষা দিবেন?" আর কাহারও নিকট দীক্ষা লইতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তখন তিনি রামানন্দের নিকট দীক্ষা লাভ করিবার এক অপরূপ উপায় স্থির করিলেন।

মণিকর্ণিকার পাষাণবাঁধান তীর্থে প্রতিদিন প্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতেই রামানন্দ স্নান করিতে আসিতেন; কবীর তাহারই একটি সোপানে শুইয়া রহিলেন। রামানন্দ যেমন প্রতিদিন আসেন তেমনই আসিলেন; অন্ধকারে কবীরের দেহে পাদস্পর্শ হইতেই তিনি 'রাম' 'রাম' বলিয়া নমস্কার করিয়া উঠিলেন; তাহার পর ধীরে ধীরে গঙ্গার কূলে নামিয়া গেলেন। কবীর গৃহে ফিরিলেন। এবার যখন সকলে কবীরকে 'নিগুরা' বলিতে আসিল, কবীর তখন বলিলেন, "আমি নিগুরা নহি, রামানন্দ আমার গুরু, তিনিই আমায় দীক্ষা দিয়াছেন।" সকলে অবাক্ হইয়া গেল এবং বলিল, "কবীর বলে কি? সাধু রামানন্দ মুসলমানকে দীক্ষা দিয়াছেন?" তাহারা ছুটিয়া গিয়া রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি কবীরের গুরু, তাহাকে আপনি দীক্ষা দিয়াছেন?" রামানন্দ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কই, মনে পড়ে না ত। তাহাকে ডাক দেখি।"

কবীর আসিলেন; রামানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি

বলিয়াছ আমি তোমার গুরু?” কবীর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “হাঁ, আপনিই আমার গুরু।” রামানন্দ বলিলেন, “আমি তোমাকে দীক্ষা দিয়াছি?” কবীর বলিলেন, “মনে নাই, মণিকর্ণিকার ঘাটে যাহার অঙ্গে পা লাগায় আপনি ‘রাম’ ‘রাম’ বলিয়াছিলেন? সে আমি; আপনি আমায় পাদস্পর্শের দীক্ষা দিয়া মন্ত্র দিয়াছিলেন, সেই আমার দীক্ষা, সেই আমার মন্ত্র।” রামানন্দ কবীরকে বক্ষে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। এমনই করিয়া এক-জন হিন্দু সাধুর সহিত একজন মুসলমান ভক্তের মিলন হইল। সারাজীবন ধরিয়া কবীর তাঁহার প্রতি-কর্ম্মে প্রতি-কথায় এই মিলনের বাণী কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

কবীর সন্ন্যাসকে স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়া-ছিলেন, “মানুষ এই সংসারে থাকিয়া তাহার সমস্ত কর্ত্তব্য করিয়াই ভগবানকে লাভ করিতে পারে; তাহার জন্য তাহাকে বনে যাইতে হইবে না, গৈরিক বসন গ্রহণ করিতে হইবে না। ভগবান প্রতি ঘটে রহিয়াছেন; তাঁহার আসন আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে পাতা আছে।” কবীর কোন দিনই তাঁহার পৈতৃক ব্যবসায় ত্যাগ করেন নাই। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন; স্ত্রী লোঈকে তিনি এক বৈরাগীর আশ্রমে লাভ করেন এবং আদর করিয়া গৃহে আনেন। কবীরের এক পুত্র ও এক কন্যা হয়। পুত্রের নাম তিনি দিয়াছিলেন কমাল ও কন্যার নাম দেন কমালী। কমাল-

কমালী কথার অর্থ ভাগ্যের পরিপূর্ণতা। তাঁহাদের জন্মে কবীরের জীবন সার্থক হইল; তাঁহার গৃহ পূর্ণ হইল; ভগবান যেন শিশুর রূপ ধরিয়া তাঁহার গৃহে আসিলেন।

জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কবীর এই প্রকারে শান্তজীবন যাপন করেন এবং হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের বহু নরনারীর জীবনে শান্তি আনিয়া দেন। অস্পৃশ্য চামার, রইদাস প্রভৃতি সকলকেই তিনি শিষ্য করিয়াছিলেন; তিনি জাতিবর্ণের কোন বিচারই রাখেন নাই। কবীর পুঁথির চেয়ে মানুষকে, পাথরের মূর্ত্তির চেয়ে ভগবানকে, এবং আচারবিচারের চেয়ে প্রেমকে বড় করিয়াছিলেন। তাই তাঁহাকে তখনকার দিনের প্রায় সকল পণ্ডিতেরই বিরুদ্ধে একা দাঁড়াইতে হইয়াছিল এবং সেইজন্যই জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে আপনার জনের নিকট হইতেও আঘাত পাইতে হইয়াছিল; কিন্তু কোন আঘাতই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। মৃত্যুর পর সকলে তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছিল।

কবীরের মরণকাহিনীও বিচিত্র। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার প্রিয় আশ্রয় কাশী ত্যাগ করিয়া মগহর নামক অন্য একটি স্থানে চলিয়া যান। কেহ বলে, লোকের অত্যাচারে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কাশী ত্যাগ করিতে হয়; কেহ বলে, তাহা নয়, তিনি স্বেচ্ছায় কাশী ছাড়িয়াছিলেন। লোকে বলে, কাশীতে মৃত্যু হইলে মানুষ স্বর্গে যায় এবং মগহরে মরিলে

পশুযোনি লাভ করে। সেইজন্য নাকি কবীর বলিয়াছিলেন, "কাশীতে মরিয়া স্বর্গে যাইলে আমার প্রেমের অধিকারের কি প্রমাণ হইল? আমি সেই মগহরে মরিয়াই মুক্তি লাভ করিয়া আমার প্রেমের সার্থকতা প্রমাণ করিব।" তিনি মগহরে চলিয়া গেলেন।

মগহরেই তাঁহার মৃত্যু হয়; মৃত্যুকালে তাঁহার অনেক বয়স হইয়াছিল। মৃত্যুর পরে মৃতদেহ লইয়া হিন্দুমুসলমানে বিরোধ বাধে। হিন্দুরা বলে, আমরা মৃতদেহের সৎকার করিব; মুসলমানেরা বলে, তিনি মুসলমান সাধক ছিলেন, আমরা মৃতদেহের সমাধি দিব। বিরোধ যখন প্রবল হইয়া আসিল, তখন একজন মৃতদেহের আবরণ খুলিয়া দেখেন, সেখানে দেহ নাই; আছে শুধু কতকগুলি সুন্দর ফুল! চারিদিক সেই ফুলের সৌরভে ভরিয়া গেল। হিন্দুরা ফুলের অর্দ্ধেক আনিয়া সৎকার করিল, আর মুসলমানেরা বাকি অর্দ্ধেক লইয়া সমাধি দিল। জীবনে কবীরের সাধনা ছিল হিন্দুমুসলমানের বিরোধ মিটানো। মরণেও তিনি এই প্রকারে ফুলের সৌরভে ও মধুতে সেই মিলন সুরভিত ও মধুময় করিয়া গেলেন।

চন্দ্রপুরের হাট

চন্দ্রপুরের হাট নদীর খুব নিকটেই। নদী হইতে উঠিয়া একটি সরু গলির মত রাস্তা আছে। এই রাস্তা দিয়া খানিকটা যাইলেই হাট।

রাস্তাটি অত্যন্ত সরু; দুইজনের অধিক মনুষ্য একসঙ্গে পাশাপাশি যাইতে পারে না। রাস্তার দুই ধারে গাছপালা ও জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে এক-একটি পর্ণকুটীর। কিন্তু কুটীরগুলির দরজা এই সরু রাস্তার দিকে নয়। এই রাস্তাটিতে বর্ষাকালে প্রায় এক হাঁটু জল দাঁড়ায়। অন্যান্য সময়েও রাস্তাটি কর্দ্দমময় হইয়া থাকে। রাস্তার জায়গায় জায়গায় দু-একটা লতা গাছ এদিক ওদিক হইতে গিয়াছে। অনেক সময় মুটেদের মাথার মোট লাগিয়া লতাগাছগুলি ছিঁড়িয়া যায়। এই পথটি দিয়া যাইলেই হাট।

হাটের দিন এই পথ দিয়া সমস্ত দিনই লোকজন যাতায়াত করে। সকলেরই মুখে একটা ব্যস্তসমস্ত ভাব। কাহারও মুখে একটু হাসিখুসীর ভাব পাওয়া যায় না। সকলেই গম্ভীর। এই পথের সম্মুখেই নদী। নদীর ধারে সারি সারি নৌকা। কোন নৌকায় আলু-পটল, কোন নৌকায় শাকসব্জি, কোন নৌকায় হাড়িকলসী ইত্যাদি রহিয়াছে। নৌকার মাঝিরা এ ওকে ডাকে, ও তাকে

ডাকে এইরূপ ব্যস্ত। কোন মাঝি হয়ত কাঁচা কলা তুলিতেছে; কোন মাঝি হয়ত হাত নাড়া দিয়া কাহাকেও ডাকিতেছে; আবার কোন মাঝি হয়ত কাহাকেও তাড়া দিতেছে। মাঝির পাশেই একজন গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সেই এই সকল জিনিষের অধিকারী। সে ভারি ব্যস্ত—একে ডাকে, ওকে ডাকে, তাকে ধমকায়; কেবল ইহাই করিতেছে।

নদী হইতে যে পথটি গিয়াছে সেই পথ দিয়া জিনিষ-পত্র যায় বটে, কিন্তু জনসাধারণ সে পথ দিয়া বড় একটা কেহ যায় না। আমরা একবার জনসাধারণ যে পথ দিয়া হাটে প্রবেশ করে সেই পথ দিয়া গিয়াছি। এই পথটি চন্দ্রপুরের বাবুরা করাইয়া দিয়াছেন, সেইজন্য ইহার নাম "বাবুদের রাস্তা" হইয়াছে।

এই পথটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; নদীতীরের পথের ন্যায় অপ্রশস্ত ও কর্দ্দমময় নয়। ইহা বরাবর চন্দ্রপুরের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। পথের দুই ধারে জল যাইবার জন্য নালা করা আছে। বর্ষাকালে বৃষ্টি হইলে পথে জল না দাঁড়াইয়া এই সকল নালা দিয়া একেবারে নদীতে পড়ে। নালার ধারে বড় বড় ঘাস জন্মিয়াছে। নালার ওদিকে বাঁশঝাড়, আমবাগান, লিচুবাগান ইত্যাদি রহিয়াছে। এই সকল গাছপালার মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র কুটীর উঁকি মারিতেছে। এই পথের ধারেই হাট।

হাট প্রতি শনি-মঙ্গলবারে বসে এবং ইহাতে অনেক লোকের সমাগম হয়। বিশেষতঃ পর্ব্বোপলক্ষ্যে হাটে ভয়ানক জনতা হয়। বারোয়ারি পূজার সময় ভিড়ে একটি গাছ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সময় সময় চন্দ্রপুরের বাবুরা জনতা-নিবারণের জন্য হাটে চার-পাঁচজন দ্বারবান রাখিয়া দেন।

চন্দ্রপুরের হাট

হাটে প্রবেশ করিয়াই প্রকাণ্ড একটি বট গাছ। গাছটির তলায় বসিয়া জন কতক দোকানদার তামাকু টানিতেছে ও ক্রেতাগণের সহিত দর কষাকষি করিতেছে। এই গাছটির পরেই একটি কামিনীফুলের গাছ। কামিনীগাছটির তলায় বসিয়া একটি ত্রেতাযুগের বুড়ী হাঁড়ি ও কলসী বিক্রয় করিতেছে। কোনও জায়গায় একটি আম্র-বৃক্ষের তলে

বসিয়া কেহ কতকগুলি আতা বিক্রয় করিতেছে; কোথাও একখানি চটের উপর বসিয়া এক বুড়ী আমড়া বিক্রয় করিতেছে; কেহ হয় ত হাজার দুহাজার জাম লইয়া এক জায়গায় বসিয়া রহিয়াছে এবং "ওগো মশায়, এই আমার কাছে নেও', সে খুব ভাল জাম" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। মেছুনীরা নানা জাতের মাছ লইয়া বসিয়া আছে। হয়ত একজন ক্রেতা চারি আনার জায়গায় দুই আনা বলিয়াছে, অমনি পালে পালে মেছুনীরা মুখ নাড়া দিয়া তাহাকে যেন খাইতে আসিতেছে। এক জায়গায় জনকতক তন্তুবায় মোটা মোটা কাপড় লইয়া বসিয়াছে, এবং ক্রেতাকে "আর দুগণ্ডা পয়সা দিও, আর দুগণ্ডা পয়সা দিও" বলিয়া ডাকিতেছে। খরিদ্দার "হবে না, হবে না" বলিয়া চলিয়াছে। তন্তুবায়গণ "আচ্ছা নাও-সে গো" বলিয়া খরিদ্দারকে ডাকিতেছে এবং নিকটে আসিলে "আর দু'ট পয়সা দিয়ে যাও" বলিয়া আপ্যায়িত করিয়া খরিদ্দারের কথানুযায়ী মূল্য লইয়াই ছাড়িয়া দিতেছে। হাটের মধ্যে এইরূপ ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে যথাসম্ভব দর কষাকষি চলিতেছে।

আজ মঙ্গলবার। দ্বিপ্রহর। একটু বাতাস নাই, এমন কি একটি গাছের পাতাও নড়িতেছে না। স্নানের বেলা হইল, লোকে কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, অনেকেই অল্প কথায় চটিয়া গরম হইয়া উঠিতেছে।

হাটের মাঝখান দিয়া একটি বেশ প্রশস্ত পথ গিয়াছে। এই পথ দিয়া চন্দ্রপুরের বাবুদের একজন সরকার ও একজন হিন্দুস্থানী দ্বারবান চলিয়াছে। হাটটি চন্দ্রপুরের বাবুদের, সেইজন্য প্রতি হাটে তাঁহারা তোলা পাইয়া থাকেন। কেহ একটা মৎস্য, কেহ আধসের আলু, কেহ গোটা কতক কাঁচা কলা, আবার কেহ দুই-তিনটি পয়সা দিয়া থাকে। ইহারা সেই তোলা আদায় করিয়া বেড়ায়।

আমাদের ঘোষেদের বাড়ীর মধুসূদন, গায়ে তেল মাখা, গলায় কাঠের মালা, কাঁধে গামছা, হাতে ঝুড়ি আম্রবৃক্ষের তলায় গিয়া কতকগুলি শাকসব্জির দিকে আঙ্গুলি বাড়াইয়া বিক্রেতাকে কহিল "এ কত করে ?"

সে বলিল, "আধ পয়সা।"

মধুসূদন কহিল, "কড়ি আছে ?"

সে বলিল, "আছে।"

এই বলিয়া সে অর্দ্ধ পয়সার কড়ি আনিয়া মধুসূদনকে দিল। মধুসূদন তাহাকে একটি পয়সা দিয়া কতকগুলি পুঁই শাক লইয়া চলিল। আজ আহারের ব্যবস্থাটা হইবে ভাল।

এখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। সূর্য্যের প্রখর জ্যোতি অনেকটা ম্রিয়মাণ হইয়া আসিয়াছে, দুএকটা সাদা সাদা মেঘ দূরস্থিত বৃক্ষাবলীর মস্তকের উপর ঢুলিয়া পড়িতেছে। হাটের অধিকাংশ লোকই গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। নদী-তীরে কেবল একখানি মাত্র নৌকা আছে, আর সমস্ত

নৌকা ফিরিয়া গিয়াছে। "বাবুদের রাস্তা" দিয়া মাঝে মাঝে রাখালেরা এক-এক পাল গরু চরাইয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ খুব ধূলা উড়ার ধুম পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে এক-একটা গাভী হাম্বা হাম্বা রবে ডাকিতেছে। ঐ দেখ, একটি লোক গৃহে প্রত্যাগমন করে নাই। নদীতীরে দাঁড়াইয়া আছে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, কিন্তু এখনও একটু একটু আলো আছে। সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে, নীলিমা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে। পাখীগুলি চারিদিক হইতে আসিয়া স্ব স্ব বাসস্থানের দিকে চলিয়াছে। আকাশের এক প্রান্তে কেবল একটি ক্ষুদ্র তারকা আপন মনে চাহিয়া আছে। পূর্ব্বোক্ত লোকটি এই সময়ে আবার হাটে প্রবেশ করিল।

হাট এখন জনশূন্য। সেথায় একটিও জনপ্রাণী নাই। গাছগুলি মস্তক অবনত করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে দু-একটি পরিত্যক্ত খড়ের চাল চারিটা বাঁশের খুঁটির উপরে দাঁড়াইয়া আছে। হাটের মধ্যস্থিত পথটির স্থানে স্থানে দুএকটি শাকসব্জির পাতা ডাঁটা ইত্যাদি পড়িয়া রহিয়াছে। লোকটি এই পথ দিয়া বরাবর চলিতেছে।

তাহার হস্তে একটি গামছা রহিয়াছে। সেই গামছায় কতকগুলি ফলমূল বাঁধা আছে। লোকটি ধীরে ধীরে এই পথ দিয়া আসিয়া "বাবুদের রাস্তায়" উপস্থিত হইল।

নগরপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর। কুটীরের সম্মুখে কতকগুলি গাছপালা রহিয়াছে। এই গাছপালাগুলির একপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র ডোবা। এই ডোবার তুই-চারি হাত তফাতেই কুটীর-দ্বার। দ্বারের একপাশে গোটা কতক ধানের গাছ গজাইয়াছে। দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে একটু ছোট বারাণ্ডার মত দেখা যায়; বারাণ্ডার একপার্শ্বে ঢেঁকি। ঘরের মধ্যে কতকগুলি হাঁড়িকুড়ি সাজান রহিয়াছে। কোনও হাঁড়িতে চারিটি চাল, কোনও হাঁড়িতে চারিটি ক্ষুদ রহিয়াছে। ঘরের কোণে ইন্দুরের গর্ত্ত। ইন্দুর মহাশয়গণ সুরঙ্গ পথ দিয়া আসিয়া কুটীর-স্বামীর দানশীলতার পরিচয় লইয়া থাকেন এবং কিচিকিচি করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। কুটীর-স্বামী কলিযুগের লোক এইজন্য এরূপ নিঃস্বার্থ উপকারীদিগকে মারিবার চেষ্টায় ফিরিয়া থাকেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কদাচিৎ কৃতকার্য্য হয়েন। এই ঘরের লাগাও আর একটি ঘর আছে। তাহার উপর হইতে একটি বাঁশ ঝুলিতেছে এবং সেই বাঁশের উপরে কতকগুলি ময়লা কাপড় তুলিতেছে। ঘরের একপার্শ্বে একটি সিন্দুক। তাহার উপরে একখানি মাতুর পড়িয়া আছে। ইহা ভিন্ন সে ঘরে অন্য কোন আসবাব নাই। উঠানের অপর দিকে যে তুএকটা ঘর আছে সেগুলি আরও ক্ষুদ্র। সেই জন্য তাহাদের কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

লোকটি কুটীরদ্বারে গিয়া বার কতক "দরজা খোল,

দরজা খোল” বলিয়া কাহাকে ডাকিল ; দরজা শীঘ্রই খুলিয়া গেল। লোকটি আস্তে আস্তে ভিতরে প্রবেশ করিল।

এক্ষণে বেশ অন্ধকার হইয়াছে। সূর্য্য-তেজ একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। অসংখ্য তারকামালা আকাশ-বক্ষে শোভা পাইতেছে। জোনাকী পোকা এক-একবার টিপ টিপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। ঝিঁঝিঁ পোকা ঝিঁঝিঁ করিতেছে। লোকটি আপন গৃহে পঁহুছিয়াছে এবং আমরা তাহাকে পঁহুছাইয়া দিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছি।

বৃক্ষের চক্ষু

বাহির হইতে দেহে আঘাত-উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে, প্রাণীর ন্যায় বৃক্ষগণও যে তাহা অনুভব করে, আমাদের দেশের মহাপণ্ডিত বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় ইহা প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। লজ্জাবতী লতার শাখায় চিম্‌টি কাটিতে থাক বা শাখার কোন অংশ একটু পোড়াইয়া দাও। দেখিবে, দূরের পাতাগুলি এই সকল অত্যাচারের বেদনায় গুটাইয়া আসিতেছে। এই বেদনাটা যে কি রকমের তাহা আমাদের জানা নাই, এবং বোধ হয় জানিবার উপায়ও নাই। কিন্তু চিম্‌টি

কাটায় বৃক্ষদেহে যে একটা পরিবর্ত্তন সুরু হয় এবং তাহা যে দেহের ভিতর দিয়া চলিয়া দূরের পাতাগুলিকে গুটাইয়া দেয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। বসু মহাশয় ইহাও দেখাইয়াছেন যে, প্রাণিদেহের ন্যায় উদ্ভিদের দেহও স্নায়ুজালে আবৃত। প্রাণীর কোন অঙ্গে বেদনা দিলে তাহা যেমন স্নায়ুসূত্রগুলির সাহায্যে সর্ব্বাঙ্গে নীত হয়, উদ্ভিদের দেহেও আঘাতের উত্তেজনা অবিকল সেই প্রকারে চলাচল করে। কিন্তু উদ্ভিদের চক্ষু আছে, এ কথাটি সম্পূর্ণ নূতন।

মনুষ্য-প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর দেহযন্ত্র ও ইন্দ্রিয়গুলি একদিনে এত উন্নত অবস্থায় উপনীত হয় নাই। বিজ্ঞানের কথা মানিলে স্বীকার করিতে হয়, লক্ষ লক্ষ বৎসরের বহু পরিবর্ত্তনের ধারায় পড়িয়া মানুষ তাহার এখনকার এমন সুব্যবস্থিত চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি লাভ করিয়াছে। সুতরাং যে সকল প্রাণী এখনও জীবপর্য্যায়ের খুব নীচের কোঠায় অবস্থিত, তাহাদের দেহে মানুষের চক্ষুকর্ণাদির ন্যায় সুব্যবস্থিত ইন্দ্রিয় না থাকারই কথা। মানুষের চক্ষুর সহিত পতঙ্গাদি ইতর প্রাণীর চক্ষুর তুলনা করিলে এই ভেদ সুস্পষ্ট বুঝা যায়। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ উদ্ভিদ্-জাতিকে জীব-পর্য্যায়ের নিম্নতম স্তরে স্থান দিয়া থাকেন। কাজেই মানুষ চক্ষুর সাহায্যে বাহিরের নানা বস্তু ও নানা বর্ণ দেখিয়া যে সৌন্দর্য্য অনুভব করে, উদ্ভিদের তাহার প্রয়োজন হয় না। আঁধার হইতে আলোককে চিনিয়া লওয়া এবং কোন্

দিক্ হইতে আলোক আসিতেছে, তাহা বুঝিয়া লওয়া যেমন নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদিগের দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রধান কার্য্য, উদ্ভিদের চক্ষুর কার্য্যও কতকটা তদ্রূপ। বৃক্ষের চক্ষুকে মানব-চক্ষুর সহিত তুলনা করা যায় না, কিন্তু ইতর পতঙ্গদিগের চক্ষুর সহিত তুলনা করিলে ইহাকে কোন অংশে হীন বলা যায় না।

জার্ম্মাণ অধ্যাপক হাবারল্যাণ্ড্ সাহেব উদ্ভিদের শরীর-তত্ত্বের অনেক কথা প্রকাশ করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বৃক্ষের চক্ষুর কথাটাও তিনি সম্প্রতি প্রচার করিয়াছেন। চক্ষুর মোটামুটি কার্য্য কি তাহা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বাহিরের নানা পদার্থের ছবি চক্ষুর ভিতর আনিয়া ফেলিতে পারিলেই তাহার কাজ এক প্রকার শেষ হইয়া যায়। অবশ্য মনুষ্য প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর চক্ষু যেমন জটিল, তাহার কার্য্যও সেই প্রকার বিচিত্র; কিন্তু সমস্ত প্রাণিজাতির চক্ষুর কার্য্য কি, তাহার অনুসন্ধান করিলে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারটিই আমাদের নজরে পড়িয়া যায়।

পাঠকের অবশ্যই জানা আছে, বাহিরের দৃশ্যকে যখন আমরা কোন সঙ্কীর্ণ স্থানে আনিতে চাই, তখন আমাদিগকে স্থূল-মধ্য কাচ ব্যবহার করিতে হয়। ফটোগ্রাফার যখন একটি চৌদ্দ পোয়া মানুষের ছবি একখানি ক্ষুদ্র কাগজের উপর উঠাইতে চাহেন, তখন তিনিও ঐ স্থূল-মধ্য কাচ ব্যবহার করেন। তাঁহার ক্যামেরার সম্মুখে সেই কাচ লাগান থাকে। বাহিরের বৃহৎ বস্তুর ক্ষুদ্র ছবি ঐ কাচেরই সাহায্যে

ছোট হইয়া ক্যামেরার ভিতর আসিয়া পড়ে। আমাদের চক্ষু যখন বাহিরের ছবিকে ছোট করিয়া ভিতরে ফেলে, তখন তাহাও ঐ কৌশল অবলম্বন করে। চক্ষুর ভিতরে অবশ্য স্থুল-মধ্য কাচ থাকে না, কিন্তু কাচের মতই এক প্রকার স্বচ্ছ তরল পদার্থ এমন-ভাবে চক্ষুর ভিতরে সজ্জিত থাকে যে, তাহা ক্যামেরার স্থুল-মধ্য কাচখণ্ডেরই ন্যায় বাহিরের নানা দৃশ্যকে ছোট করিয়া অক্ষি-পর্দ্দার উপরে ফেলে। সুতরাং বৃক্ষের কোন অঙ্গে যদি ঐ প্রকার স্থুল-মধ্য স্বচ্ছ পদার্থ দেখা যায় এবং তাহা বাহিরের দৃশ্যকে ছোট করিয়া বৃক্ষ-দেহের ভিতর ফেলিতেছে, ইহাও যদি অনুসন্ধানে জানা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হয়, গাছের চক্ষু আছে। সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত জার্ম্মাণ পণ্ডিতটি গাছের শাখাপত্রাদির ছালে অবিকল এই প্রকার চক্ষু আবিষ্কার করিয়াছেন। ছালের উপরিভাগে যে সকল কোষ সজ্জিত থাকে, তাহাদেরই মধ্যে কতকগুলি একপ্রকার অতি স্বচ্ছ রসে পূর্ণ থাকিয়া স্থুল-মধ্য কাচের মত কার্য্য করে। ইহাতে যে, কোষগুলির মধ্যে কেবল বাহিরের দৃশ্যাবলীর ক্ষুদ্র ছবি আসিয়া পড়ে, তাহা নহে, বাহিরের সূর্য্যকিরণের তাপও এই স্থুল-মধ্য স্বচ্ছ পদার্থের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া কোষে জমা হয় এবং ইহাতে উদ্ভিদ্‌কোষ সক্রিয় হইয়া পড়ে।

বৃক্ষের পাতায় ও ছালে পরিব্যাপ্ত এই সহস্র সহস্র চক্ষু-গুলি বাহিরের দৃশ্যের সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ছবি কোষের মধ্যে

উৎপন্ন করিয়া কি কার্য্য সম্পন্ন করে, তাহা বলা কঠিন ; কিন্তু তাই বলিয়া এই চক্ষুগুলি যে বৃথা ছবি উৎপন্ন করে, তাহা কখনও বলা যায় না। পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, সাধারণ মক্ষিকার দুই পার্শ্বে যে দু'টা বড় বড় চক্ষু দেখা যায়, সেগুলি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষুর সমষ্টি ; মক্ষিকার প্রত্যেক চক্ষুটি প্রায় চারি হাজার অতি ক্ষুদ্র চক্ষুর যোগে উৎপন্ন ; সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে এগুলিকে সুস্পষ্ট দেখা যায়। প্রজাপতির চক্ষুসংখ্যা আবার আরও অধিক ; ইহাদের মস্তকের দুই পার্শ্বে যে দু'টা চক্ষু থাকে, তাহাদের প্রত্যেকটি সতের হাজার ক্ষুদ্রতর চক্ষুর যোগে উৎপন্ন। মক্ষিকা, প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গগণ এই সহস্র সহস্র চক্ষুর সাহায্যে তাহাদের চারিদিকের দৃশ্যাবলীকে কি প্রকারে দেখে, তাহা আমাদের জানা নাই ; কিন্তু দেহরক্ষার জন্য এই সকল চক্ষুর যে কোন প্রকার কার্য্য আছে, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। অধ্যাপক হাবারল্যাণ্ড সাহেব বলিতেছেন, উদ্ভিদের পত্রে ও শাখার উপরে যে অসংখ্য চক্ষু সজ্জিত রহিয়াছে, সেগুলি পতঙ্গের চক্ষুর ন্যায়ই কার্য্য করে। যেদিন পতঙ্গের দৃষ্টিতত্ত্ব আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইবে, হয় ত সেই দিনই বৃক্ষের চক্ষুগুলির কার্য্য আমরা বুঝিতে পারিব।

মন্ত্রের সাধন

প্রশান্ত মহাসাগরে অনেকগুলি দ্বীপ দেখা যায়। এই দ্বীপগুলি অতি ক্ষুদ্র প্রবাল-কীটের পঞ্জরে নির্ম্মিত। বহু সহস্র বৎসরে অগণ্য কীট নিজ নিজ দেহদ্বারা এই দ্বীপগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে।

আজকাল বিজ্ঞান দ্বারা যে অসাধ্য সাধন হইতেছে, তাহাও বহুলোকের ক্ষুদ্র চেষ্টার ফলে। মানুষ পূর্ব্বে একান্ত অসহায় ছিল। বুদ্ধি, চেষ্টা ও সহিষ্ণুতার বলে আজ সে পৃথিবীর রাজা হইয়াছে। কত কষ্ট ও কত চেষ্টার পর মনুষ্য বর্ত্তমান উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। কে প্রথমে আগুন জ্বালাইতে শিখাইল, কে প্রথমে ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা দিল, কে লেখার প্রথা আবিষ্কার করিল, তাহা আমরা কিছুই জানি না। এই মাত্র জানি যে, প্রথমে যাঁহারা কোন নূতন প্রথা প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পদে পদে অনেক বাধা পাইয়াছিলেন। অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। এত কষ্টের পরেও অনেকে তাঁহাদের চেষ্টা সফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আপাততঃ মনে হয়, তাঁহাদের চেষ্টা একেবারে বৃথা গিয়াছে। কিন্তু কোন চেষ্টাই একেবারে বিফল হয় না। আজ

যাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে হয়, দুইদিন পরে তাহা হইতেই মহৎ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রবাল-দ্বীপ যেমন একটু একটু করিয়া আয়তনে বর্দ্ধিত হয়, জ্ঞানরাজ্যও সেইরূপ তিল তিল করিয়া বাড়িতেছে। এ সম্বন্ধে দুই একটি ঘটনা বলিতেছি।

এক শত বৎসর পূর্ব্বে ইটালিদেশে গ্যাল্‌ভানি নামে এক জন অধ্যাপক দেখিতে পাইলেন যে, লোহা ও তামার তার দিয়া একটা মরা ব্যাঙ্‌কে স্পর্শ করিলে ব্যাঙ্‌ নড়িয়া উঠে। তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া এই ঘটনাটির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এরূপ সামান্য বিষয় লইয়া এত সময়ের অপব্যয় করিতে দেখিয়া, লোকে তাঁহাকে উপহাস করিত। তাঁহার নাম হইল, "ব্যাঙ্‌ নাচান অধ্যাপক"। বন্ধুরা আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "মরা ব্যাঙ্‌ যেন নড়িল, কিন্তু ইহাতে লাভ কি ?"

কি লাভ ? সেই যৎসামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া বিদ্যুতের বিবিধ গুণ সম্বন্ধে নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইতে আরম্ভ হইল। এই একশত বৎসরের মধ্যে বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা পৃথিবীর ইতিহাস যেন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিদ্যুৎ দ্বারা পথঘাট আলোকিত হইতেছে, গাড়ী চলিতেছে, মুহূর্ত্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্তের সংবাদ অন্য প্রান্তে পৌঁছিতেছে সমস্ত পৃথিবীটি যেন আমাদের ঘরের কোণে আসিয়াছে,— দূর আর দূর নাই! আমাদের কণ্ঠস্বর বাড়ীর এক দিব

হইতে অন্য দিকে পৌঁছিত না। এখন বিদ্যুতের বলে সহস্র ক্রোশ দূরের বন্ধুর সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছি। এমন কি, এই শক্তির সাহায্যে দূর দেশে কি হইতেছে, তাহা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইব। আমাদের দৃষ্টি ও আমাদের স্বর আর কোন বাধা মানিবে না।

মনুষ্য এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর এবং সমুদ্রের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু বহুদিন আকাশ জয় করিতে পারে নাই। ব্যোমযানে শূন্যে উঠা যায় বটে, কিন্তু বাতাসের প্রতিকূলে বেলুন চলিতে পারে না। আর এক অসুবিধা এই যে, বেলুন হইতে অল্প সময়ের মধ্যেই গ্যাস্ বাহির হইয়া যায়, এজন্য বেলুন অধিকক্ষণ শূন্যে থাকিতে পারে না।

রেশমের আবরণ হইতে গ্যাস্ বাহির হইয়া যায় বলিয়া বেলুন অধিকক্ষণ আকাশে থাকিতে পারে না। সোয়ার্জ্জ্ নামে একজন জার্ম্মাণ এইজন্য আলুমিনিয়ম্ ধাতুর বেলুন প্রস্তুত করেন। আলুমিনিয়ম্ কাগজের ন্যায় হাল্কা, অথচ ইহা ভেদ করিয়া গ্যাস্ বাহির হইতে পারে না। বেলুন যে ধাতু নির্ম্মিত হইতে পারে, ইহা কেহ বিশ্বাস করিল না। সোয়ার্জ্জ্ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বহু-বৎসরব্যাপী নিষ্ফল চেষ্টার পর অবশেষে বেলুন নির্ম্মিত হইল। বেলুন যাহাতে ইচ্ছানুক্রমে বাতাসের প্রতিকূলে যাইতে পারে, এজন্য একটি ক্ষুদ্র এঞ্জিন প্রস্তুত করিলেন। জাহাজে যেমন জলের নীচে স্ক্রু থাকে, এঞ্জিনে স্ক্রু ঘুরাইলে

জল কাটিয়া জাহাজ চলিতে থাকে, সেইরূপ বাতাস কাটিয়া চলিবার জন্য একটি বড় স্ক্রু নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু বেলুন নির্ম্মিত হইবার অল্প পরেই সোয়ার্জ্জের অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। তিনি সমস্ত সম্পত্তি ও জীবন যাহাতে পণ করিয়াছিলেন, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিলেন না; এতদিনের চেষ্টা নিষ্ফল হইতে চলিল।

সোয়ার্জ্জের সহধর্ম্মিণী তখন জার্ম্মাণ-গভর্ণমেণ্টের নিকট বেলুন পরীক্ষা করিবার জন্য আবেদন করিলেন। জার্ম্মাণ-গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধে ব্যোমযান ব্যবহার করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, কিন্তু সোয়ার্জ্জের বেলুন যে কখনও আকাশে উঠিতে পারিবে, কেহ তাহা বিশ্বাস করিল না। কেবল বিধবার দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া গভর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া সেই বেলুন পরীক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ-বিভাগের কতিপয় অধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে বেলুন দেখিবার জন্য বহু লোক আসিল। পরীক্ষকেরা আসিয়া দেখিলেন, বেলুনটি অতি প্রকাণ্ড এবং ধাতুর নির্ম্মিত বলিয়া রেশমের বেলুন অপেক্ষা অনেক ভারী। তার পর বেলুন চালাইবার জন্য এঞ্জিন ও অনেক কল বেলুনে সংযুক্ত রহিয়াছে। এরূপ প্রকাণ্ড জিনিষ কি কখনও আকাশে উঠিতে পারে! পরীক্ষকেরা একে অন্যের সহিত বলাবলি করিতে লাগিলেন, এই অদ্ভুত কল কোনদিনও পৃথিবী ছাড়িয়া উঠিতে পারিবে না। লোকটা মরিয়া গিয়াছে; আর তাহার বিধবা অনেক আশা করিয়া দেখাইতে

আসিয়াছে, সুতরাং অন্ততঃ নামমাত্র পরীক্ষা করিতে হইবে। তবে বেলুনের সহিত অতগুলি কল ও জঞ্জাল রহিয়াছে; ওগুলি কাটিয়া বেলুনটিকে একটু হাল্কা করিলে, হয় ত দুই চারি হাত উঠিতে পারে। হায়! তাহাদিগকে বুঝাইবার কেহ ছিল না। বেলুন যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, পৃথিবীতে তাঁহার স্বর আর শুনা যাইবে না! যে সমস্ত কল অনাবশ্যক বলিয়া কাটিয়া ফেলা হইল, তাহা আবিষ্কার করিতে অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। ঐ কলগুলির দ্বারা বেলুনকে, ইচ্ছানুক্রমে দক্ষিণে বামে, উর্দ্ধে ও অধোদিকে চালিত করা যাইত।

ইহার পর আর এক বাধা পড়িল। সোয়ার্জ্জের অবর্ত্তমানে বেলুন কে চালাইবে? অপরে কি করিয়া কলের ব্যবহার বুঝিবে? সে যাহা হউক, দর্শকদিগের মধ্যে একজন ইঞ্জিনিয়ার সাধ্যমত কল চালাইতে সম্মত হইলেন। অদূরে বিধবা কলের প্রত্যেক স্পন্দন গুণিতেছিলেন।

বেলুন পৃথিবী হইতে উঠিতে পারিবে কি? মৃতব্যক্তির আশা-ভরসা এইবারে হয় পূর্ণ হইবে, নতুবা একেবারে নির্ম্মূল হইবে। কল চালান হইল, অমনি বেলুন পৃথিবী ছাড়িয়া মহাবেগে শূন্যে উঠিল। তখন বাতাস বহিতেছিল, কিন্তু প্রতিকূল বাতাস কাটিয়া বেলুন ছুটিল। এতদিনে সোয়ার্জ্জের চেষ্টা সফল হইল। কিন্তু লোকের যে সব কল অনাবশ্যক মনে করিয়াছিল, স্বল্পকালের মধ্যেই তাহার আবশ্যকতা

প্রমাণিত হইল। বেলুন আকাশে উঠিল বটে, কিন্তু তাহা সামলাইবার কল না থাকাতে, অল্পক্ষণ পরেই ভূমিতে পতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু এই দুর্দ্দশাতে সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, সোয়ার্জ্জ যে অভিপ্রায়ে বেলুন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা কোনদিন হয় ত সফল হইবে। দশ বৎসরের মধ্যেই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। জেপেলিন্ যে ব্যোম-যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা যুদ্ধে ভীষণ অস্ত্র হইয়াছিল। যুদ্ধের পর এই ব্যোমযান আট্‌লান্টিক্ মহাসাগর অনায়াসে পার হইয়াছে এবং তাহার পর হইতে ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে।

পাখীরা কি সহজে উড়িয়া বেড়ায়! মানুষ কি কখনও পাখীর মত উড়িতে পারিবে? বড় বড় পাখীগুলি কেমন দুই-চারিবার পাখা নাড়িয়া শূন্যে উঠে, তার পরে পাখা বিস্তার করিয়া চক্রাকারে আকাশে ঘুরিতে থাকে এবং ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে মিলিয়া যায়।

তোমাদের কি কখনও পাখীর মত উড়িবার ইচ্ছা হয় নাই? জার্ম্মাণী-দেশে 'লিলিয়ানথাল' মনে করিলেন, আমরা কেন পাখীর মত আকাশে ভ্রমণ করিতে পারিব না? তাহার পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি জানিতেন, এই বিদ্যাসাধন করিতে অনেকদিন লাগিবে। শিশু যেমন একটু একটু করিয়া অনেক চেষ্টায় হাঁটিতে শিখে, তাঁহাকেও সেইরূপ করিয়া উড়িতে শিখিতে হইবে। কিন্তু শিশু যেরূপ পড়িয়া

গেলে আবার উঠিতে চেষ্টা করে, আকাশ হইতে পড়িয়া গেলে আর ত উঠিবার সাধ্য থাকিবে না—তখন মৃত্যু নিশ্চিত ! এত বিপদ্ জানিয়াও তিনি পরীক্ষা হইতে বিরত হইলেন না। অনেক পরীক্ষার পর নানাপ্রকার পাখা প্রস্তুত করিলেন এবং সেগুলি বাহুতে বাঁধিয়া পাহাড় হইতে ঝাঁপ দিয়া, পাখায় ভর করিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন। একবার তাঁহার মনে হইল যে, দুই পাখার পরিবর্ত্তে যদি অধিক সংখ্যক পাখার ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে উড়িবার বেশী সুবিধা হইতে পারে। চেষ্টা করিয়া দেখিলেন, তাহাই ঠিক।

ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত অতি সাবধানে তিনি এই সব পরীক্ষা করিতেছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়া গিয়াছে, এজন্য তাঁহার কার্য্য শেষ করিতে অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। এখন যে কল প্রস্তুত করিলেন, তাড়াতাড়িতে তাহা পূর্ব্বের মতন দৃঢ় হইল না ; তিনি সেই অসম্পূর্ণ কল লইয়াই উড়িতে চেষ্টা করিলেন। এবার অতি সহজেই বাতাস কাটিয়া যাইতে-ছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ বাতাসের ঝাপ্‌টা আসিয়া উপরের একখানা পাখা ভাঙ্গিয়া দিল। এ দুর্ঘটনায় তিনি প্রাণ হারাইলেন। কিন্তু তিনি যে সব পরীক্ষা দ্বারা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন, তাহা পৃথিবীর সম্পত্তি হইয়া রহিল। তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বের সাহায্যে পরে উড়িবার কল নির্ম্মাণ সম্ভব হইয়াছে। মার্কিন-দেশে অধ্যাপক ল্যাঙ্গ্‌লি পাখা-সংযুক্ত উড়িবার কল প্রস্তুত করিলেন ; তাহাতে অতি হাল্কা

একখানি এঞ্জিন সংযুক্ত ছিল। পরীক্ষার দিন অনেক লোক দেখিতে আসিয়াছিল। কিন্তু কর্ম্মকারের শৈথিল্যবশতঃ একটি স্ক্রু ঢিলা হইয়াছিল! এঞ্জিন চালাইবার পর কল আকাশে উঠিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল; এমন সময় ঢিলা স্ক্রুটি খুলিয়া গেল এবং কলটি নদীগর্ভে পতিত হইল। এই বিফলতার দুঃখে ল্যাঙ্গ্‌লি ভগ্ন-হৃদয়ে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

যাহারা ভীরু, তাহারাই বহু ব্যর্থ সাধনা ও মৃত্যু-ভয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। বীর পুরুষেরাই নির্ভীক চিত্তে মৃত্যুভয়ের অতীত হইতে সমর্থ হন। ল্যাঙ্গ্‌লির মৃত্যুর পর তাঁহাবাই স্বদেশী উইলবার রাইট্ উড়িবার কল পুনরায় পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। উড়িবার সময় একবার কল থামিয়া যাওয়াতে আকাশ হইতে পতিত হইয়া রাইটের একখানা পা ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতেও ভীত না হইয়া রাইট্ পুনরায় পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন এবং সেই চেষ্টারই ফলে মানুষ গগনবিহারী হইয়া নীলাকাশে তাহার সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

নচিকেতা

(১)

প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনের একটি কাহিনী বলিব। কেমন করিয়া একজন ঋষিবালক পিতৃ-সত্য-পালনের জন্য অন্ধকার যমপুরীতে গিয়া জ্ঞানলাভ কয়িয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, ইহা তাহারই কাহিনী। আমাদের দেশের প্রাচীনতম শাস্ত্র উপনিষদে এই গল্পটি পাওয়া যায়। সেকথা যে কত পুরাতন আজ তাহার হিসাবই নাই; তাহার মধ্যে শত শত বৎসর আগেকার ভারতের তোমাদেরই মত একজন বালকের তপস্যার কথা তোমরা শুনিবে।

প্রাচীন ভারতের ছবি কল্পনা করিয়া দেখ। তখনও বড় বড় রাজ্য ছিল, রাজা ছিলেন এবং তাঁহাদের বড় বড় রাজপ্রাসাদ ছিল। সেগুলি তাঁহাদের ধনরত্নের এবং ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দিত; কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাণ সেখানে ছিল না। নগরের কোলাহল হইতে বহুদূরে বনের মধ্যে, নদীর তীরে, পাহাড়ের পায়ের তলায় ঋষিদের আশ্রম ছিল; সেইখানেই ছিল ভারতবর্ষের প্রাণ। প্রাচীন ঋষিরা সেখানে প্রকৃতির সেই নির্জ্জন সৌন্দর্য্যের মধ্যে তপস্যা করিতেন; ভারতের

যাহা সত্য ঐশ্বর্য্য তাহাই তাঁহারা রক্ষা করিতেন। রাজা সে আশ্রমে প্রবেশ করিতে আসিলে তপোবনের বাহিরে তাঁহার রাজ-ঐশ্বর্য্যের সকল চিহ্ন ত্যাগ করিয়া নত-মস্তকে অতি সাধারণ লোকেরই মত আসিতেন; ঋষির তপস্যার নিকটে তাঁহার ঐশ্বর্য্য নত হইত। শান্তির নীড় এই আশ্রমগুলিতে ব্রহ্মচারিগণ আসিয়া গুরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতেন, এবং শুদ্ধ সংযত চিত্তে জ্ঞানলাভ করিতেন। ঋষিগণের সকলেই যে চিরকুমার থাকিতেন তাহা নহে। কেহ কেহ জ্ঞানলাভ করিয়া বিবাহ করিয়া সন্তানাদি লইয়াও বাস করিতেন; গুরুপত্নীগণ বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারীদিগকে পুত্রেরই মত স্নেহদৃষ্টিতে দেখিতেন; ব্রহ্মচারিগণও গুরুপত্নীকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিয়া সেবা করিতেন।

তপোবনে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সকলেই নিদ্রা ত্যাগ করিতেন। তাহার পর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সুস্নাত এবং শুচি হইয়া ঋষি ও শিষ্যগণ ঋক্‌মন্ত্রে দেবতার বন্দনা করিতেন। তাহার পর কখনও বা ঋষি আমলকী অথবা অশোক-তরুর মূলে বসিয়া শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেন, কখনও বা আশ্রমের অন্যান্য কর্ম্মে শিষ্যগণ চলিয়া যাইত। আশ্রমে হিংসা নাই। হরিণশিশু নির্ভয়ে আসিয়া আশ্রমপ্রাঙ্গণে শিষ্যগণদত্ত নীবার ধান্য খাইয়া যায়, ময়ূর ময়ূরী মনের আনন্দে নৃত্য করে; আশ্রম-গাভী পরম তৃপ্তিতে সকলের সেবা লাভ করে কোথাও বা বৃক্ষের শাখায় সিক্ত বল্কল ঝুলাইয়া দিয়া

সদ্যঃস্নাত শিষ্য বৃক্ষমূলে বসিয়া আপন মনে মন্ত্রশিক্ষা করে ; কোথাও বা গুরুপত্নী যবাগূ রন্ধন করিয়া সকলকে আহ্বান করিয়া তাহা বিতরণ করেন। কোনদিন বা ঋষি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বেদীর চারিদিকে সকলে দাঁড়াইয়া, কেহ মন্ত্র পাঠ করেন, কেহ অগ্নিতে আহুতি দেন। যজ্ঞে বলি প্রদত্ত হয় ; কেহ পশু-বলি দেন, কেহ বা দেন না।

ইহাই প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনের একটি ছবি। আশ্রমগুলি যেন এক একটি বৃহৎ পরিবার। ঋষি ও ঋষি-পত্নী সেই পরিবারের মাতাপিতা ; ঋষির পুত্রকন্যাগণ এবং শিষ্যগণ সকলেই সেই পরিবারের সন্তান। মধুর স্নেহ-বন্ধনে, সকলে পরস্পরের সহিত বদ্ধ। শুধু মানুষ নহে, চারিদিকের প্রকৃতির সঙ্গেও সকলেরই মধুর সম্বন্ধ ছিল ; আশ্রমের সকলেই বৃক্ষগুলির পরিচর্য্যা করিতেন ; হরিণ, গাভী প্রভৃতি আশ্রমের পশুগুলিও তাঁহাদের স্নেহ ও সেবা হইতে বঞ্চিত হইত না। ভাবিয়া দেখ, সে কি সুন্দর ব্যবস্থা! তাঁহারা যেন জানিতেন বৃক্ষেরও প্রাণ আছে। যে তরু পুষ্প দেয়, সে বিনিময়ে স্নেহ-পরিচর্য্যা কামনা করে – যে গাভী দুগ্ধ দিয়া জীবন রক্ষা করে, তাহার আমাদের নিকটেও কিছু প্রাপ্য আছে।

(২)

এমনই এক আশ্রমে সেদিন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। চারিদিকে ব্যস্ততার সাড়া দেখা দিয়াছে। এই আশ্রমের

যিনি ঋষি তাঁহার নাম বাজশ্রবস। তিনি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

পিতা বাজশ্রবা সারাজীবন অন্নদান করিয়া কীর্ত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন। পুত্র বাজশ্রবস আরও কীর্ত্তি কামনা করিয়া এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ইহাতে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয়; ঋষিও তাহাই দিবেন। বহু ঋষি এই অপূর্ব্ব যজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছেন। চারিদিকে উৎসবের কোলাহল, সকলেরই মুখে আনন্দের হাসি। সকলেই যজ্ঞ-ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যজ্ঞবেদীতে যজ্ঞপতি সপ্তজিহ্ব অগ্নি লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া জ্বলিতেছেন; ঋত্বিক্ বেদমন্ত্র পাঠ করিতেছেন; হোতা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতেছেন; উদ্গাতা মধুর স্বরে সাম-গান করিতেছেন। গানের সুরে, মন্ত্রের গম্ভীর ধ্বনিতে, ঘৃতের গন্ধে, যজ্ঞভূমি পরিপূর্ণ। একপাশে দক্ষিণার বস্তু—ধনরত্ন, বস্ত্র, এবং গাভী।

যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল; এইবার দক্ষিণা দিতে হইবে। ঋষি একে একে ধনরত্ন, মণিকাঞ্চন, বস্ত্র প্রভৃতি সর্ব্বস্ব দান করিলেন; এইবার তিনি সমবেত ব্রাহ্মণগণকে গাভীগুলি দান করিবেন। ইহাতে তাঁহার যজ্ঞ সার্থক হইবে। আনন্দে ঋষিদের ও সমবেত সকলের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া

কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও একটি শিশু নিরানন্দ।

চারিদিকে চাহিয়া এই সৌম্যদর্শন সুকুমার শিশুর চিত্ত ভারাক্রান্ত হইয়াছে; তাহার চোখে অশ্রু দেখা দিয়াছে! শিশু বাজশ্রবসেরই পুত্র, নচিকেতা। যজ্ঞের দক্ষিণারূপে যে গাভীগুলি দেওয়া হইবে সেইগুলিকে দেখিয়া তাহার শিশুচিত্তে শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে; পিতার কল্যাণকামনার শুভবুদ্ধি তাহার মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে। সে ভাবিতেছে— পিতা একি করিলেন? এই যে গাভীগুলি তিনি দক্ষিণায় দিবেন, সেগুলি অকর্ম্মণ্য, ইহারা আর দুগ্ধ দিবে না, তৃণজল গ্রহণ করিবে না: এগুলিকে দান করিলে পাপ হইবে। যে এরূপ গাভী দান করে, সে আনন্দ লাভ করে না—সে অ-নন্দ অর্থাৎ সুখহীন লোকে গমন করে। পিতা পাপ করিতেছেন?

নচিকেতা ভাবিলেন, "পুত্র হইয়া আমাকেই পিতাকে এ পাপ হইতে রক্ষা করিতে হইবে; যজ্ঞ যেন ব্যর্থ না হয়; তাহার জন্য যদি আমার প্রাণ দিতে হয়, তাহাও ভাল।"

এই ভাবিয়া নচিকেতা পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "তাত! আমাকে কাহাকে দিলেন।" বাজশ্রব তখন অন্যমনস্ক ছিলেন, তাঁহার মন যজ্ঞসমাপ্তির আত্মপ্রসাদে মগ্ন ছিল; তিনি পুত্রের প্রশ্ন শুনিতে পাইলেন না। নচিকেতা আবার সেই প্রশ্ন করিলেন, বাজশ্রবস এবার শুনিয়াও শুনিলেন না; ভাবিলেন, নচিকেতা একি অর্থহীন অশিষ্ট প্রশ্ন করিতেছে! কিন্তু পিতার উপেক্ষায় নচিকেতার

মন টলিল না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ, আমাকে কোন ঋত্বিককে দক্ষিণারূপে দান করিলেন ?" বার বার প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া ক্রুদ্ধ পিতা কোন চিন্তা না করিয়া উত্তর দিলেন, "বৈবস্বত মৃত্যুকে তোমাকে দান করিলাম।"

নচিকেতা ভাবিলেন, ক্রুদ্ধ পিতা একি কথা বলিলেন ? পিতার স্নেহভাজনদিগের মধ্যে আমি মুখ্যস্থান লাভ করিয়াছি ; আজ্ঞাপালন করিয়া আমি তাঁহার প্রিয় হইয়াছি ; অধম ত' হই নাই—পিতা আমাকে এরূপ আদেশ কেন করিলেন ?"

পুত্রের মন পিতার উপেক্ষায় বিষণ্ণ হইল। পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, "আমাকে দিয়া যমের কোন্ কর্ত্তব্য পিতা পূর্ণ করিবেন ? নিশ্চয়ই পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া একথা বলিয়াছেন ; ইহা তাঁহার অন্তরের কথা নহে।"

নচিকেতা ভাবিলেন, "কিন্তু তবুও পিতার বাক্য যেন মিথ্যা না হয় ; যমের নিকট আমাকে যাইতে হইবে ; পিতৃসত্য, পিতার বচন পালন করিতে হইবে।"

নচিকেতা পিতার নিকট বিদায় লইতে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, কোথায় যাইবে ?" নচিকেতা বলিলেন, "পিতা আপনি আমাকে মৃত্যুকে দিয়াছেন ; তাঁহারই নিকট আমি যাই ; বিদায় দিন, আশীর্ব্বাদ করুন।"

পুত্রের কথায় বাজশ্রবসের চমক ভাঙ্গিল তিনি ভাবিলেন, "একি করিয়াছি—প্রাণপ্রিয় পুত্রকে ক্রোধের বশে মৃত্যুকে

দিয়াছি!” বাজশ্রবসের হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। যজ্ঞপূর্ণ হইয়াছে, যজ্ঞ ফল লব্ধ হইয়াছে, সকলের প্রশংসায় চারিদিক মুখরিত হইয়াছে, বাজশ্রবসের চিত্তও শান্তির ও তৃপ্তির নির্ম্মল আনন্দে পরিপূর্ণ, এমন সময়ে একি ঘটনা! পিতার মন কাঁদিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, “কিন্তু বৎস, ক্রুদ্ধ হইয়া আমি ওকথা বলিয়াছিলাম। আমার হৃদয় ত' সেকথায় সায় দেয় নাই। যাইও না, তুমি যাইও না; আমি যমকে তোমাকে দিই নাই।”

নচিকেতা ঋষির পুত্র। যাঁহারা সত্যের জন্য সর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন, সত্যই যাঁহাদের তপস্যা ও আদর্শ, তিনি তাঁহাদেরই সন্তান এবং তাঁহাদেরই কুলে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শিশু হইলে কি হয়, তাঁহারও চিত্তে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের তপস্যার সত্যদীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়াছিল। নচিকেতা বলিলেন, “তাত, আমার পিতৃপিতামহগণ সত্যকে একান্তভাবেই আশ্রয় করিয়াছিলেন; তাঁহাদের কথা ভাবিয়া দেখুন! যে সত্য আপনি উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা আমাকেই পালন করিতেই হইবে। আপনার বচন মিথ্যা হইবে না। আর দুঃখ করিতেছেন কেন? মানুষ শস্যতৃণের ন্যায় একবার মরিতেছে, আবার জন্মগ্রহণ করিতেছে; বর্ষাকালে বৃষ্টিধারায় সিক্ত যে ধরণী শ্যামল তৃণে ভরিয়া যায়, গ্রীষ্মের আগমনে তাহা শুষ্ক ধূসর হইয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাই আবার কিছুদিনের মধ্যেই নবতৃণদলে শ্যামল হইয়া

উঠে। জন্মমৃত্যু অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত। আপনি মৃত্যুতে ভয় পাইবেন না; অনুমতি দিন, আমি যমের গৃহে গমন করি।"

কিন্তু পিতার প্রাণ কি প্রবোধ মানে? তিনি ঋষি, নিজের সত্যবচনকে অস্বীকার করিবেন কি করিয়া? পুত্রের কথা শুনিয়া একদিকে যেমন তাঁহার হৃদয় ব্যথায় কাঁদিয়া উঠিল, অন্যদিকে পুত্রের মহত্ত্বে এবং সত্যনিষ্ঠায় মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। হাঁ, নচিকেতা তাঁহার উপযুক্ত সন্তানই বটে; তাহাকে জন্ম দিয়া কুল পবিত্র হইয়াছে; তাহার জননী কৃতার্থ হইয়াছেন। ধন্য পুত্র! ধন্য তুমি!

ঋষির চোখ জলে ভরিয়া উঠিল; আনন্দকোলাহলপূর্ণ আশ্রমভূমি তাঁহার দৃষ্টিতে অন্ধকার হইয়া আসিল; তবুও পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিতে হইল। এইবার সত্য সত্যই বাজশ্রবসের বিশ্বজিৎ যজ্ঞ পূর্ণ হইল। তাঁহার সর্ব্বস্ব তাঁহার নয়নাভিরাম প্রিয়তম পুত্রকেও তিনি সত্যের নিকট দক্ষিণা দিলেন।

নচিকেতা পিতাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

(৩)

নচিকেতা যমপুরীর অভিমুখে চলিলেন। অন্ধকার পথ, সে পথে আলোর রেখা নাই; সে পথে চলিতে ভয় পায়

না, এমন মানুষ কোন দিন জন্মগ্রহণ করে নাই। সেই পথে নচিকেতা চলিলেন। তাঁহার বুক কাঁপিল না, পা টলিল না। সত্যের দীপ্ত জ্যোতি তাঁহার মুখমণ্ডল এবং সর্ব্ব অঙ্গ দিয়া বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। তিনি ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন; তাঁহার কাহাকে ভয়?

নচিকেতা যমপুরীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার অঙ্গের দীপ্তিতে অন্ধকারও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কিন্তু সে ত' দীপ্তি নয়, যেন অগ্নিশিখা; তাঁহার সম্মুখে দাঁড়ায় সে সাহস কাহার?

যম গৃহে ছিলেন না; অতিথিকে কে বরণ করিয়া লইবে? সে গৃহে কাহারও এমন সাহস নাই, যে সাক্ষাৎ অগ্নিরূপী এই সত্যব্রত ব্রহ্মচারীকে অভ্যর্থনা করিয়া লয়।

নচিকেতা তিন রাত্রি কোনরূপ পাদ্যার্ঘ্য না লইয়া, আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া যমপুরীতে বাস করিলেন।

তিন রাত্রি পরে যম গৃহে ফিরিতেই তাঁহার মন্ত্রিগণ ও স্ত্রী আসিয়া বলিলেন, "করিয়াছ কি? গৃহদ্বারে সাক্ষাৎ বৈশ্বনরের মতই জ্যোতির্ম্ময় অতিথি আজ তিন রাত্রি অভ্যর্থনা গ্রহণ না করিয়াই বাস করিতেছেন; তাঁহার তেজে এ পুরী যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে! যাও, শীঘ্র তাহাকে পাদ্যাসন দিয়া শান্ত কর।" যম শীঘ্র অতিথির উপযুক্ত অর্ঘ্য দিয়া নচিকেতাকে

অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "যে অল্পবুদ্ধি পুরুষের গৃহ হইতে অতিথি অভুক্ত ফিরিয়া যান, তাহার গৃহ হইতে সমস্ত কল্যাণ, সমস্ত শ্রী, সর্ব্বযজ্ঞের ফল, এবং পুত্রবিত্ত সকলই বিদায় লয়। হে নমস্য অতিথি, হে ব্রাহ্মণ, আপনি আমার গৃহে তিনরাত্রি অভুক্ত আছেন; আপনি আমার নমস্কার গ্রহণ করুন; আমার কল্যাণ হউক। আপনি তিনটি বর প্রার্থনা করুন।"

যম গৃহপতিরূপে তাঁহার আতিথ্যধর্ম্ম পালন করিলেন বটে, কিন্তু এই শিশুকে দেখিয়া তিনি যেমন বিস্মিত হইলেন, তেমনি মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন—"এই ক্ষুদ্র শিশু, এ আবার কি জন্য আমার এই ভয়ঙ্কর পুরীতে আসিয়াছে, কি ইহার প্রার্থনা ?"

যমের আতিথ্যে প্রসন্ন হইয়া নচিকেতা প্রথম বর প্রার্থনা করিলেন, "হে যম, হে মৃত্যুলোকের অধিপতি, যদি বর দিতে চাহ, তবে এই প্রথম বর আমাকে দাও, যেন যখন তোমার নিকট হইতে ফিরিয়া যাইব, তখন যেন আমার পিতার ক্রোধ শান্ত হয়: তিনি যেন শান্তসংকল্প হইয়া প্রসন্নচিত্তে আমাকে চিনিতে পারিয়া আমাকে গ্রহণ করেন।"

পিতৃভক্ত নচিকেতা পিতার বিরক্তিসৃষ্টি করিয়া তাঁহার ক্রোধ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে পীড়িত করিয়াছিল। তাই তাঁহার প্রথম প্রার্থনা, পিতা যেন তাঁহার

প্রতি পূর্ব্ব স্নেহ বিস্মৃত না হন্ এবং তিনি যেন তাঁহার পুত্রকে সস্নেহে গ্রহণ করেন।

যম ও নচিকেতা

যম বলিলেন, "তাহাই হইবে। মৃত্যুর মুখ হইতে যখন তুমি ফিরিয়া যাইবে, পিতা তোমাকে সস্নেহে গ্রহণ

করিবেন। সুখরাত্রির প্রভাতে চিত্ত যেমন প্রসন্ন হয়, তেমনি প্রসন্নচিত্তে তিনি অভ্যর্থনা করিয়া লইবেন। এখন দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর।"

নচিকেতা তখন বলিলেন, "স্বর্গে জরা নাই, মৃত্যু তুমিও নাই। সেখানে লোকে ভয় অতিক্রম করিয়া পরম শান্তিময় অমরত্ব লাভ করে। সেই স্বর্গলোকের সাধন, যে অগ্নি, যে যজ্ঞ, তাহা তুমি জান। আমি শ্রদ্ধাবান্; আমাকে তুমি তাহার জ্ঞান দাও। ইহাই আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা।"

যম নচিকেতার অনুরোধ শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে সেই জ্ঞান দান করিলেন এবং তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন।

তখন নচিকেতা তাঁহার শেষ এবং শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা জানাইলেন, "হে মৃত্যু, মরণের পর লোক কোথায় যায় কেহই সেকথা জানে না, শুধু তুমিই তাহা জান; সেই পরম জ্ঞান আমি শিষ্যরূপে তোমার নিকট গ্রহণ করিব। তাহাই আমাকে দাও—ইহাই আমার প্রার্থনা।"

যম স্তম্ভিত হইলেন। শিশু এ কী কথা বলে? এ কী অসম্ভব প্রার্থনা তাহার? যে জ্ঞান মানুষের কথা দূরে থাক্ দেবতারাও লাভ করিতে পারে নাই, শিশু নচিকেতা তাহাই প্রার্থনা করিতেছে?

যম বলিলেন, "না, না, শিশু, আমাকে এ অনুরোধ

করিও না, করিও না, দেবের অলভ্য জ্ঞান প্রার্থনা করিও না ; অন্য বর গ্রহণ কর।"

নচিকেতা এই পরমতত্ত্ব লাভ করিবার জন্য দৃঢ়চিত্ত হইয়াছিলেন। তিনি যমকে বলিলেন, "যমরাজ, জানি দেবতারাও সে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই ; তাই আমি সে জ্ঞান চাই ; তোমার মত গুরু আর কোথায় পাইব, আর ইহার চেয়ে দুর্লভ জ্ঞান আর কি আছে ?"

যম বলিলেন, "না, না, শিশু, মরণের রহস্য তুমি জানিতে চাহিও না। আর যাহা চাহ প্রার্থনা কর, সব দিব—এ প্রার্থনা করিও না। বৎস ! শত বৎসর আয়ু, পুত্র পৌত্র, ধনরত্ন, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, যাহা চাও, তাহা দিব। তোমার সমস্ত কামনা পূর্ণ করিব—মনুষ্যলোকে দুর্লভ যাহা সকলই দিব, কিন্তু মরণের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।"

নচিকেতা আর কিছুই চাহেন না—হিরণ্য অশ্ব, বিত্ত, বিলাস কিছু তাঁহার কাম্য নহে, তিনি জ্ঞান চাহেন, তাহার বিনিময়ে আর কিছুই লইবেন না।

দৃঢ়স্বরে তিনি বলিলেন, "না, মৃত্যু, আমি কিছুই চাহি না ; জানি, চাহিলে এ সকলই আমি পাইতে পারি ; কিন্তু বিত্তে ত' মানুষের তৃপ্তি নাই ; আমি মরণরহস্য জানিতে চাই—সেই জ্ঞান তুমি আমাকে দাও।"

শিশু ভুলিল না। পৃথিবীর সমস্ত ধনরত্ন তাহাকে

প্রলুব্ধ করিয়া সত্য লক্ষ্য হইতে তাহাকে ভ্রষ্ট করিতে পারিল না। মানুষের যাহা কাম্য সকলই সে অবহেলায় ত্যাগ করিল।

নচিকেতার নিষ্ঠা দেখিয়া যমের চিত্ত শ্রদ্ধায়, প্রশংসায় পূর্ণ হইল। শিশুর নিষ্ঠার নিকটে ধর্ম্মরাজকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল।

যমের নিকট মরণের রহস্য জানিয়া এবং দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া পূর্ণকাম নচিকেতা গৃহে ফিরিলেন। আবার আশ্রম আনন্দকোলাহলে মুখরিত হইল। বাজশ্রবস হারান সন্তানকে বক্ষে ফিরাইয়া পাইলেন। নচিকেতার সত্য সংকল্প এবং তাঁহার তপস্যা সার্থক হইল।

রোগীর সেবা

যে বাটীতে রোগীর সেবা ভাল না হয়, সে বাটী ভাল নয়। সে বাটীতে স্নেহ-মমতা কম, স্বার্থপরতা বেশী, আত্মত্যাগশক্তি ন্যূন, বিলাসিতা অধিক। সে বাটীর স্ত্রী-পুরুষেরা সহজেই ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, কখনও তাহারা উন্নত জীবনের অধিকারী হইতে পারে না।

যে বাটীতে রোগীর সেবা ভাল হয়, সে বাটীর অনেকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে, তাহার কয়েকটী উল্লেখ করিতেছি—

(১) সে বাটীতে গৃহোপকরণের মধ্যে এমন কতক দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী এবং প্রয়োজনীয়। যথা, জলগরমের পাত্র, ফ্লানেল এবং মলমল কাপড়ের টুক্‌রা, খলনুড়ি, হামানদিস্তা, মেজার গ্ল্যাস, উষ্ণ জলে না ফাটিয়া যায় এমন বোতল, ভাল নিক্তি, বেড্‌প্যান, থার্ম্মোমিটার এবং ঔষধের একটি বাক্স বা আলমারি।

(২) সে বাটীতে কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কাহার কোন পীড়া হইলে তাহা যতই সামান্য হউক, বাটীর কর্ত্তা তাহার তৎক্ষণাৎ সংবাদ প্রাপ্ত হন।

(৩) সে বাটীতে যদি কোন কঠিন পীড়া উপস্থিত হয়,

তবে বাটীর ছেলেরা পর্য্যন্ত তাহার জন্য বিশিষ্টরূপে আদিষ্ট হয়।

(৪) অধিক পীড়ায়, সমস্ত বাটী উপশান্তভাব ধারণ করে, কেহই কাহারও সহিত কলহে প্রবৃত্ত হয় না, কেহই উচ্চৈঃস্বরে কথা কহে না, বাটীর কেহই সশব্দে চলিয়া বেড়ায় না। ছেলেরাও আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া চলে।

(৫) রোগীর নিকটে থাকিবার জন্য পাহারাবদলের ন্যায় দিবারাত্রির মধ্যে পারিবারিক স্ত্রী এবং পুরুষদিগের নিয়োগ হইয়া যায়। যাহারা সেবায় নিযুক্ত হয়, অপরে তাহাদিগের তৎকালীন করণীয় গৃহকার্য্যসমস্ত আপনাদের মধ্যে বিভাজিত করিয়া লয় এবং সমস্ত গৃহকার্য্য সুশৃঙ্খলায় চলিতে থাকে; বাসনের বা অন্যবিধ গৃহোপকরণের কোন রূপ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না।

(৬) রোগীর পথ্য এবং ঔষধ যথাসময়ে প্রদত্ত হইতে থাকে—তাড়াতাড়িও নাই, বিলম্বও নাই—বিন্দুমাত্র কোন বিপর্য্যয় নাই। বাটীর অনেকেই রোগীকে পথ্যাদিপ্রদানে সক্ষম হয়।

(৭) রোগের লক্ষণ দেখা এবং চিকিৎসককে তাহা অবগত করান পরিবারের মধ্যে অনেকের সাধ্য হইয়া থাকে।

(৮) রোগের চিকিৎসায় ব্যয়কুণ্ঠতার নামগন্ধও থাকে না।

রোগীর সেবা পরিবারবর্গের যে কত দূর করা উচিত,

আমি তাহার কোন বিশেষরূপ ইয়ত্তা করিতে পারি নাই। এই বিষয়ে আমাদিগের সম্মিলিত পরিবারের গুণবত্তা আমার চক্ষে অপরিসীম বলিয়াই বোধ হইয়াছে। ঐ সময়ে মিলিত পরিবারবর্গের অর্থ এবং মন এক হইয়া যায়।

যদি রোগীর সেবার কোন সীমা থাকে, তবে সে সীমা বাহির হইতে নির্দ্দিষ্ট হইবার নয়। সে সীমা, সেবার উদ্দেশ্য কি, ইহাই বিচার করিয়া পাওয়া যাইতে পারে। সেবার উদ্দেশ্য পীড়িতকে রোগমুক্ত করা। রোগীর মনে ভয়সঞ্চার হইলে রোগমুক্তির চেষ্টা বিফল হইতে পারে। এইজন্য এমনভাবে সেবা করা আবশ্যক, যাহাতে রোগী মনে না করিতে পারে যে, তাহার জন্য পরিবার অতি ভীত হইয়া পড়িয়াছে। তুমি স্ত্রী, কি পুত্র, কি ভ্রাতা, রোগীর সেবায় নিযুক্ত হইয়া আছ—তোমার আহার করিবার সময় হইল, আর যে ব্যক্তি তোমার স্থান গ্রহণ করিবে, সে রোগীর ঘরে আসিলে—তোমাকে খাইতে যাইবার অবসর দিল—তুমি যাইতে চাহ না। ইহাতে রোগী কি ভাবিবে? তুমি তাহার পীড়ার আতিশয্যে ভীত হইয়াছ, ইহাই বুঝিবে না কি? এবং তাহা বুঝিলে স্বয়ং ভীত হইবে না কি? অতএব ওরূপ করিও না। ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আহার করিতে যাও। আর তুমি মা, শিশু পীড়িত হইয়া তোমার ক্রোড়ে শায়িত—তুমি রাত্রিদিন তাহার মলিন মুখমণ্ডলের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছ। খাইতে যাও না, একেবারে শরীর-

পান করিতেছ। যদি শিশু তোমার দুধ খায়—তবে তোমার শোক-বিহ্বল-হৃদয়-শোণিত দূষিত হইতেছে—তোমার দুগ্ধ, যাহা উহার সর্ব্বাপেক্ষা সুপথ্য, তাহা বিষবৎ হইয়া উঠিতেছে, তুমি অধীরা হইয়া শিশুরও কোন উপকারই করিতে পারিতেছ না, উহাকে দূষিতস্তন্যরূপ বিষ পান করাইয়া তাহার সাক্ষাৎ বধভাগিনী হইতেছ। মনে কর, উটি যেন শিশু নয়,—তোমার ক্রন্দনের, হা-হুতাশের, উপবাসের ও অনিদ্রার প্রকৃত হেতুই বুঝিতে সমর্থ। তাহা হইলে ত ও বড়ই ভীত হইত। কিন্তু যাহাতে রোগী ভীত হইতে পারে এমন কাজ করিতে নাই। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আপনার শরীরকে সুস্থ রাখ, শিশুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ্যটি নষ্ট করিও না। এই জন্যই প্রাচীনা গৃহিণীরা বলিতেন,—পীড়িত ছেলেকে কোলে করিয়া চক্ষের জল ফেলিতে নাই।

তবে কি রোগীর নিকট হাস্য, কৌতুক, বিদ্রূপাদি করিয়া দেখাইব যে, আমি তাহার পীড়ায় কিছুমাত্র ভীত হই নাই? বরং এ পক্ষ অবলম্বন করা ভাল, তথাপি অধীর এবং ভয়-বিহ্বল হওয়া ভাল নয়। কিন্তু এরূপ কৃত্রিম ব্যবহারেও অনেক দোষ আছে। যাহা কৃত্রিম এবং মিথ্যা, তাহার সমগ্র ফল কখনই উত্তম হইতে পারে না। রোগী ঐ কৃত্রিমতার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া বিরক্ত হইবে, অথবা যদি প্রবেশ করিতে না পারে, তোমাকে নির্ম্মম এবং হৃদয়শূন্য মনে করিবে—অথবা স্বয়ং হাস্য-পরিহাসে যোগ দিতে গিয়া

নিজের নাড়ী চঞ্চল এবং স্নায়ুমণ্ডল বিলোড়িত করিয়া তুলিবে। অতএব ওরূপ কৃত্রিমতাও দূষ্য।

রোগীর সেবক সর্ব্বদা রোগীর প্রতি তন্মনস্ক হইয়া থাকিবেন—তাহার কি কষ্ট হইতেছে, তাহা বিনা কথনে এবং বিনা ইঙ্গিতে বুঝিবেন এবং সেই কষ্ট নিবারণের যে উপায় আছে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রয়োগ করিবেন; কোন ব্যস্ততার লক্ষণ দেখাইবেন না—স্বয়ং ধীর ও শান্ত-মূর্ত্তি হইয়া পীড়িত-রূপ দেবতার পূজা করিতে থাকিবেন।

পীড়িতের সেবকে আর দেবতার সাধকে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। সাধককে স্থিরাসন হইয়া থাকিতে হয়। চঞ্চল লোকেরা, যাহারা সর্ব্বদা এপাশ ওপাশ হইয়া বসিতে থাকে, একভাবে স্থির থাকিতে পারে না, তাহারা ভাল সেবক হয় না। সাধককে নিশ্চল-দৃষ্টি হইতে হয়। তাহার হৃদয়ে ধ্যানগম্য ইষ্টমূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ জাগরূক থাকে। সেবককেও পীড়িতের পূর্ব্বমূর্ত্তি এবং পূর্ব্বভাব দৃঢ়রূপে স্মরণ রাখিতে হয়। তাহা হইলেই ব্যাধিজনিত লক্ষণবিপর্য্যয়, তাঁহার লক্ষ্যমধ্যে আইসে। সাধকের পক্ষে তন্মনস্ক হওয়া অত্যাবশ্যক। সেবককেও পীড়িতের প্রতি তন্মনস্ক হইয়া থাকিতে হয়। তাহা না থাকিলে তিনি উহার কোন্ সময়ে কি প্রয়োজন হইতেছে তাহা বুঝিতে পারেন না—রোগীকে কথা কহিয়া বা ইঙ্গিত করিয়া আত্ম-নিবেদন ব্যক্ত করিতে হয়। রুগ্ন ব্যক্তিরা তাহা করিতে পারে না এবং চাহেও না;

সুতরাং বড়ই বিরক্ত এবং দুঃখিত হয়। যে সেবকে বা সেবিকাতে সাধকের এই সকল গুণ বিদ্যমান, তিনি রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেই রোগীর প্রফুল্লতা জন্মে; তিনি আসিয়াই যেন জানিতে পারেন—একটু জল চাই—কি দুই চারিটা দাড়িমের দানা চাই—গায়ের চাদরটা একটু পায়ের দিকে টানিয়া দিতে হইবে,—বালিশটা একটু উচ্চ করিয়া দিতে হইবে,—ফুলগুলি সরাইয়া একটু দূরে বা নিকটে রাখিতে হইবে—শীতল হস্তটি কপালে দিতে হইবে—ঠিক এতটুকু চাপিয়া বা আল্‌গা করিয়া দিতে হইবে,—ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি আস্তে আস্তে নিজে ঐ কাজগুলি করিতে থাকেন,—পীড়িতের বদনমণ্ডলে মৃদু-হাস্যের আভা দেখা দেয়—সেবক কৃতার্থ হন।

পরিজনগণ উল্লিখিতভাবে রোগীর সেবা করিবে। গৃহস্বামী সকলকে সতর্ক করিয়া দিবেন, যেন পীড়িতের বিছানা, বালিশ, বস্ত্রাদি বাটীর অপর কাহার বস্ত্রাদির সহিত না মিশে—তাহার মলমূত্রক্লেদাদি বাটী হইতে অধিক দূরে নিক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কৃত হয়—তাহার ব্যবহৃত পাত্রাদি বাটীর সাধারণ পাত্রাদি হইতে স্বতন্ত্র থাকে—এবং সেবকেরা যতদূর পারেন, যে কাপড়ে রোগীর ঘরে থাকেন, সে কাপড় না ছাড়িয়া যেন বাটীর অপর লোকের বিশেষতঃ বালকবালিকা-দিগের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে না আইসেন। গৃহস্বামী পীড়ার প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া এই সকল আদেশ দিবেন এবং সমস্ত

পরিজন সেই আদেশ পালন করিবে। গৃহস্বামীর আদেশ যে পরিজনেরা পালন করিবে, সে কথা দৃঢ়রূপে বলিবার প্রয়োজন এই যে, স্ত্রীলোকেরা বিশেষতঃ পীড়িত ছেলের মায়েরা এই বিষয়ে একটু ভ্রমান্ধ। তাঁহারা ছেলের বিষ্ঠামূত্র ঘৃণা করা অকল্যাণকর মনে করিয়া ঐ সকল আদেশপালনে শিথিলযত্ন হইয়া থাকেন। বাস্তবিক পীড়িতের মলমূত্রে ঘৃণা করা অকল্যাণ বটে এবং তাহা করিতেও নাই; কিন্তু এস্থলে ঘৃণাপ্রদর্শন হইতেছে না, কেবলমাত্র সংস্রব-দোষ নিবারণের উপায়বিধান হইতেছে। ছেলের মায়েরা যেন কখনই না ভুলেন যে, এক মাতৃগর্ভসম্ভূত সন্তানদিগের পীড়া আপনাদিগের মধ্যে বড়ই সহজে সংক্রামিত হয়; আর বয়স্কদিগের পীড়া শিশুদিগকে যত শীঘ্র আক্রমণ করে, শিশুর পীড়া বয়স্ককে তত শীঘ্র আক্রমণ করিতে পারে না। যুবা এবং প্রৌঢ়দিগের পীড়াও সংক্রামকধর্ম্মী হইয়া থাকে। বৃদ্ধের পীড়াই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সংক্রামক।

ঋতুবৈচিত্র্য

ঋতুবৈচিত্র্যের জন্য চিরদিন ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধি আছে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত প্রত্যেক ঋতু পর্য্যায়-ক্রমে অভিনব রূপ গ্রহণ করিয়া ভারতে অবতীর্ণ হয়। গ্রীষ্মে যখন তাপদগ্ধা বসুন্ধরা বারিধারা প্রার্থনা করে, এবং রুদ্রমূর্ত্তি বৈশাখঝটিকা ধূলিধ্বজা উড়াইয়া ও মেঘ-গর্জ্জনচ্ছলে শঙ্খনাদ করিয়া সলিল বর্ষণ করে, তখন প্রকৃতির এক নূতন মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। ইহার পরে, ধরিত্রী যখন নব আষাঢ়ের স্নিগ্ধ জলধারায় সুস্নাত হইয়া শ্যামলদূর্ব্বাদলবসনে দেহ আবৃত করে, তখন প্রকৃতির আর এক মূর্ত্তি প্রকাশ পায়। তাহার কিছুদিন পরে, শেফালিকাপ্রভৃতির গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইয়া উঠে, এবং দিগন্তবিস্তৃত হরিৎ শস্যক্ষেত্র ক্রমে সুবর্ণবর্ণে শোভিত হইয়া ধরণীতে শরৎ ও হেমন্তের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করে। তৎপরে আবার কৃষকগণের নবশস্যলাভের আনন্দ-ধ্বনি-মধ্যে যখন শিশিরের অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠে, এবং বসন্তের দক্ষিণ-বায়ুস্পর্শে যখন বৃক্ষলতাগুল্ম নবপুষ্পপত্রে পুলক প্রকাশ করিতে থাকে, তখন প্রকৃতিদেবীর অপর এক কান্তি দৃষ্টিগোচর হয়।

এই সকল প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, যে সকল সাগর-মহাসাগর দেশকে বেষ্টন

করিয়া আছে, এবং যে সকল নদীগিরি ও সুবিস্তীর্ণ উচ্চনিম্ন-ভূমি ভারতের বৈচিত্র্যবিধান করিতেছে, তাহাদের অবস্থা-নাদির আলোচনা, এবং বায়ুপ্রবাহের প্রতি দৃষ্টিপাত আবশ্যক।

কোন স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে চতুর্দ্দিকের বায়ু-রাশি সবেগে আগমন করিয়া তাহা প্রবলতর করে। গৃহ-দাহের সময়ে এই প্রকার বায়ুপ্রবাহ সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। হয়ত অন্যত্র প্রকৃতি নির্ব্বাত, কিন্তু যে গৃহ-খানি দগ্ধ হইতেছে, তাহার চতুর্দ্দিক্ হইতে বায়ুরাশি ঝটিকা-বেগে তথায় ধাবিত হইয়া অগ্নিকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। পণ্ডিতগণ বলেন, অগ্নির তাপে বায়ু প্রসারিত হইয়া লঘুতর হয়, এবং তদ্রূপ হইলে, তাহা আর পার্শ্বের ঘনবায়ুর ভিতরে অবস্থান করিতে পারে না। জলের তুলনায় কাষ্ঠ লঘু, এজন্য কাষ্ঠ জলমগ্ন করিতে গেলে, তাহা যেমন ভাসিয়া উঠে, অগ্নির সংস্পর্শে যে বায়ুরাশি স্ফীত হইয়াছে, তাহাও অবিকল সেইপ্রকারে উপরে উঠিতে আরম্ভ করে। কিন্তু কোন স্থান স্বভাবতঃ বায়ুশূন্য থাকিতে পারে না; সুতরাং অগ্নির উপরিস্থিত বায়ু লঘুতর হইয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিলেই, পার্শ্বের বায়ু দ্রুতবেগে আসিয়া শূন্য স্থান পূর্ণ করে। কেরোসিনের দীপের চারিদিকে যে কাচের আবরণ থাকে, তাহার উপরে কতকগুলি ক্ষুদ্র কাগজের টুকরা ছাড়িয়া দিলে, সেগুলিকে উর্দ্ধদিকে উঠিতে দেখা যায়। ইহাও লঘু বায়ুর উর্দ্ধগমনের অপর উদাহরণ। অগ্নি-

শিখার তাপে আবরণের উপরিস্থিত বায়ু স্ফীত ও লঘু হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহা পূর্ব্ব-স্থানে স্থির না থাকিয়া উপরে উঠিতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কাগজগুলিকেও উড়াইয়া লইয়া যায়। বায়ুপ্রবাহমাত্রেরই উৎপত্তির মূলে লঘু বায়ুর ঊর্দ্ধগমন এবং তথায় পার্শ্বস্থ বায়ুর সবেগে আগমন, এই দুই ব্যাপার বর্ত্তমান থাকে। বৈশাখের অপরাহ্নে যখন মহাঝটিকার তাণ্ডবনৃত্য আরব্ধ হয়, এবং শতক্রোশব্যাপী ঘূর্ণীবায়ু আবর্ত্তন করিতে করিতে যখন ধনজনপূর্ণ বহু অর্ণবপোত ও নগরের ধ্বংসসাধন করে, তখনও বুঝিতে হয়, পৃথিবীর কোন অংশের বায়ুরাশি নিশ্চয়ই কোন কারণে লঘু হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে এবং সেই কারণে অন্য স্থান হইতে বায়ু তাহার স্থান পূরণ করিবার জন্য সবেগে আগমন করিতেছে। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি কয়েক মাস ব্যাপিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ হইতে যে স্বাস্থ্যপ্রদ সুখস্পর্শ বায়ু অবিরাম মৃদুবেগে প্রবাহিত হয় এবং পরে উত্তর দিক্ হইতে যে মৃদু বায়ুপ্রবাহ আসিয়া শীত ঋতুর সূচনা করে তাহা দেখিলেও বুঝিতে হয়, দেশের বা দেশ-সন্নিহিত কোন স্থানের বায়ুরাশি অবিরাম লঘু হইয়া উপরে উঠিতেছে, এবং এই কারণে শূন্য স্থান পূরণ করিবার নিমিত্ত পার্শ্বের বায়ু দ্রুতবেগে আগমন করিয়া প্রবাহের উৎপত্তি করিতেছে।

বায়ুপ্রবাহের সহিত দেশের বৃষ্টিপাতের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আবার ঋতুবৈচিত্র্য বারিপাতেরই উপরে

নির্ভর করে। দক্ষিণ বায়ুই সমুদ্র হইতে জলীয়বাষ্প বহন করিয়া ভারতে প্রবিষ্ট হয়। তাহার পরে, স্থানীয় শীতল বায়ুযোগে বা উচ্চপর্ব্বতের শীতলস্পর্শে সেই বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘের সৃষ্টি করে। সেই মেঘই বৃষ্টিধারায় পরিণত হয়। সুতরাং সজল সমুদ্রবায়ুর প্রবাহকেই বর্ষার সৌন্দর্য্যের মূলকারণ বলা যাইতে পারে। ইহার পর, এই বায়ুপ্রবাহের পরিবর্ত্তন হইলে যখন আকাশ মেঘনির্মুক্ত, এবং বর্ষার বারি-ধারাপুষ্ট বৃক্ষলতা ফলপুষ্পে পরিশোভিত হয়, তখন শরৎ ও হেমন্ত ঋতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। শীতঋতুর শোভাও উত্তরাগত শীতল বায়ুপ্রবাহের উপরে নির্ভর করে। এই প্রবাহ জলীয়বাষ্পবর্জ্জিত ! এই কারণে, শীতের আকাশ নির্ম্মল থাকে এবং প্রচুর শিশিরপাত হয়। কতকগুলি উদ্ভিদ্ এই শিশিরেই পুষ্ট ও সুন্দর হইয়া দাঁড়ায় এবং কতকগুলি আবার শীতল বায়ুর স্পর্শে শ্রীভ্রষ্ট ও স্তব্ধ হইয়া বসন্তের ঈষদুষ্ণ বায়ুপ্রবাহের প্রতীক্ষায় কালযাপন করে। ফাল্গুনে দিনগুলি দীর্ঘতর হইলে, এবং দক্ষিণ বায়ুর প্রবাহ আরব্ধ হইলে, এই সকল মৃতবৎ বৃক্ষলতায় নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়, তখন উহারা পুরাতন পত্রাবলী জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়া নূতন শ্যামলবসনে দেহ আবৃত করে, এবং নবপুষ্পপত্রে বসন্তশ্রীকে মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে বৎসরের নানা সময়ে যে সকল বায়ুপ্রবাহ উৎপন্ন হয় তাহারাই ভারতের ঋতুপরিবর্ত্তনের মূল কারণ।

গৌড়ের কীর্ত্তিচিহ্ন

আধুনিক মালদহের নিকটবর্ত্তী গৌড়ে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যের ত্রিধারার যে অপূর্ব্ব মিশ্রণ দেখা যায়, ভারতের অতি অল্পস্থানেই তাহা দৃষ্ট হয়। কোন্ সময়ে কোন্ রাজা গৌড়ে প্রথম রাজ্য স্থাপন করেন, ইতিহাসে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের উল্লেখ দেখিয়া অনেকে মনে করেন, ইহাই সেই প্রাচীন নগর। ইহা তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালনরপতিগণের রাজধানী ছিল। ইঁহাদের রাজ্যই কালক্রমে সেনরাজগণের অধিকার-ভুক্ত এবং তৎপরে মুসলমাননরপতিদিগের করতলগত হয়। সুতরাং গৌড় বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান এই ত্রিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী নরপতিগণের রাজলক্ষ্মীর লীলাভূমি। তৃণগুল্মাচ্ছাদিত যে রাজবর্ত্ম এখন শ্বাপদকুলের বিচরণপথ হইয়াছে, তদ্দ্বারা এককালে বহু হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ নরপতি বিজয়যাত্রায় বহির্গত হইতেন। গৌড়ের ভগ্নতোরণ, সমাধিমন্দির, ভজনালয় প্রভৃতি হিন্দু মুসলমান ও বৌদ্ধ স্থাপত্যচিহ্ন ধারণ করিয়া অদ্যাপি পূর্ব্বসমৃদ্ধির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

যাঁহারা কীর্ত্তিচিহ্ন পরিদর্শন করিতে গৌড়-অঞ্চলে গমন করেন, প্রথমেই গৌড়ের অদূরে পাণ্ডুয়ার আদিনা মস্‌জিদ তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এত বৃহৎ এবং এত সুন্দর

মস্‌জিদ ভারতে অতি অল্পই দেখা যায়। প্রসিদ্ধ মুসলমান নরপতি সামসুদ্দিন ইলিয়াসের বংশধর সুলতান সেকেন্দর সাহের রাজত্বকালে এই কারুকার্য্যময় মস্‌জিদের নির্ম্মাণ আরব্ধ হয়। চতুর্দ্দিকে বহু প্রকোষ্ঠ এবং মধ্যে উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ এখনও আদিনার পূর্ব্বতন গৌরব ঘোষণা করিতেছে। বাহ্য সৌন্দর্য্যের তুলনায় ইহার আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যই অধিক। অভ্যন্তরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে "বাদশাহ তখ্‌ত" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় আট হাত উচ্চ একটি সুবিস্তৃত শিলাময় উপাসনামঞ্চ এই নামে খ্যাত। ইহারই পুরোভাগে কৃষ্ণমর্ম্মরনির্ম্মিত কারু-কার্য্যময় যে এক প্রাচীর বর্ত্তমান, তাহার সৌন্দর্য্য আজও অতুলনীয় রহিয়াছে। আদিনার প্রত্যেক ইষ্টক ও প্রস্তর অতুল কারুকার্য্যময়। বঙ্গে মুসলমান-স্থপতিবিদ্যা যে কত উন্নত ছিল, আদিনা মস্‌জিদ দেখিলে তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

আদিনা মস্‌জিদের পরেই কয়েকটি অতি প্রসিদ্ধ ভগ্ন অট্টালিকা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাদের একটির নাম একলক্ষী।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত বিদ্যানুরাগী বাদসাহ হোসেন সাহের পুত্র সুলতান নসরৎ সাহের রাজত্বকালে গৌড়ে বারদুয়ারী নির্ম্মিত হয়। ইহা একটি জুমা-মস্‌জিদ। তাহার পূর্ব্বদিকে বৃহৎ প্রাঙ্গণ বর্ত্তমান; এবং উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব

হইতে যাহাতে সহস্র সহস্র উপাসক অনায়াসে মস্‌জিদে প্রবেশ করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনটি তোরণ দণ্ডায়মান। স্বয়ং বাদসাহ এই মস্‌জিদেই প্রজামণ্ডলীর সহিত একত্র নমাজ করিতেন। ইহার সৌন্দর্য্য অপর অট্টালিকা অপেক্ষা কোন
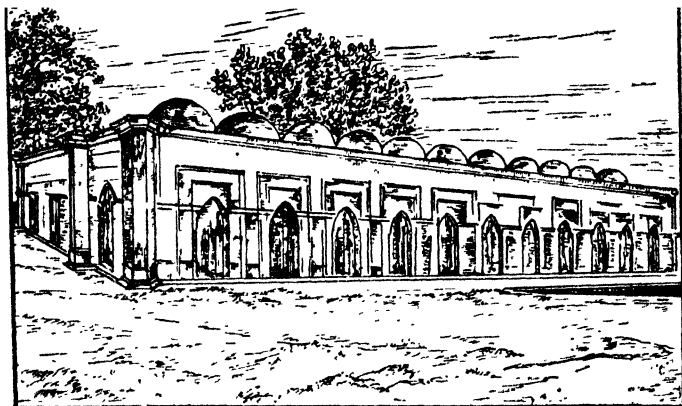
সোণামস্‌জিদ্

অংশে হীন নহে। এই মস্‌জিদের সকল প্রকোষ্ঠেই যে সকল সুবিন্যাস্ত খিলান আছে সেগুলি অতি সুন্দর। বারদুয়ারীর নির্ম্মাণে বাদসাহের প্রচুর ব্যয় হইয়াছিল। এই নিমিত্ত অনেকে ইহাকে সোণামস্‌জিদও বলিয়া থাকে।

সোণামস্‌জিদের নিকটেই দুর্গতোরণ "দখল-দরওজা" বিদ্যমান এবং তাহার পরেই অনতিদূরে "ফিরোজ-মিনার" অবস্থিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন সময়ে বার্ব্বকসাহ নামক

বাদসাহ পূর্ব্বোক্ত দুর্গতোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কি উদ্দেশ্যে দুর্গপ্রাকারের বাহিরে ফিরোজ-মিনার নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারেন না। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, সম্ভবতঃ উপাসকমণ্ডলীকে ভজনালয়ে আহ্বান করিবার জন্যই ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।
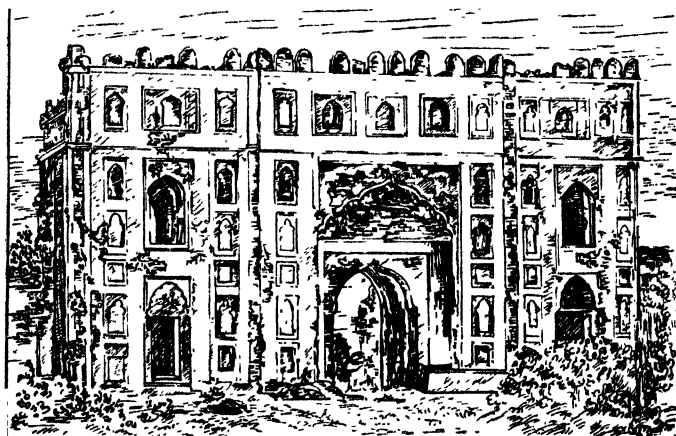
লুকোচুরি তোরণ, গৌড়

কেহ কেহ আবার ইহাকে "প্রহরিমন্দির" বলিয়া অনুমান করেন। যাহা হউক, এই ৫৪ হাত দীর্ঘ মিনার যেরূপ বৃহৎ, সেইরূপ পরম রমণীয়—এককালে যে প্রকাণ্ড কারুকার্য্যময় গম্বুজ ইহার শোভা বর্দ্ধন করিত, এখন তাহা নাই এবং ইহার সোপানাবলীও এখন ভগ্নদশাপন্ন; তথাপি সৌন্দর্য্যে ইহা

অনেক প্রাচীন অট্টালিকাকে পরাভব করিতেছে। কথিত আছে ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে আবিসিনীয় বাদসাহ মালেক ইদ্দিল ফিরোজ-মিনার নির্ম্মাণ করেন। আশা পীর নামক জনৈক বিখ্যাত ফকীর ইহাতে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। স্থানীয় নিরক্ষর কৃষকদিগের নিকট প্রাচ্য শিল্পের আদর্শস্থানীয় এই মিনারটি "চেরাগদানী" নামে খ্যাত।

লোটন-মস্‌জিদের ধ্বংসাবশেষ গৌড়ের আর একটি দর্শনীয় স্থান। বহু জনশ্রুতি এই প্রাচীন মস্‌জিদের সহিত জড়িত রহিয়াছে। কোন্ বাদসাহকর্ত্তৃক কোন্ সময়ে ইহার নির্ম্মাণ হয়, ঐতিহাসিকগণ তাহা অদ্যাপি স্থির করিতে পারেন নাই। মস্‌জিদটি দীর্ঘ সরোবরতীরে অবস্থিত। যে সকল ইষ্টকে ও প্রস্তরে ইহা নির্ম্মিত তাহাদের বিচিত্র বর্ণ এবং সুন্দর বিন্যাস পরম মনোরম। উত্তরভারতে লোটন-মস্‌জিদের ন্যায় উৎকৃষ্ট ভজনালয় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

পূর্ব্বোক্ত মস্‌জিদের দক্ষিণে "কোতয়ালীদ্বার" নামে যে প্রহরিমন্দির আছে, তাহাও আর একটি দর্শনীয় বস্তু। ৮৬০ হিজরী শকে বাদসাহ মামুদ শাহের রাজত্বকালে ইহা নির্ম্মিত হয়। দূর হইতে ইহার দৃশ্য অতি সুন্দর।

এতদ্ব্যতীত গৌড়ে নগরপ্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, এবং "কদমরসুল" প্রভৃতি যে শতশত ভগ্ন অট্টালিকা আছে, সেইগুলিরও শিল্পনৈপুণ্য দর্শককে স্তম্ভিত করে। অতি প্রাচীন কালে যখন গৌড় হিন্দু ও বৌদ্ধ নরপতিদিগের

অধিকারে ছিল, সে সময়ের যে দুই একটি আছে তাহাও চমৎকার।

"কদমরস্থল" ইসলামধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদের পদচিহ্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, গৌড়েশ্বর হোসেন সাহ আরব দেশের মদিনা হইতে ইহা রাজধানী গৌড়ে আনয়ন করেন। ইহারই পুত্র নসরৎ সাহ এক সুন্দর মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে "কদমরস্থলের" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখন সেই মস্‌জিদই "কদমরস্থল নামে খ্যাত। কিন্তু ইহাতে আর "কদমরস্থল" নাই। তাহা কোথায় কিরূপে স্থানান্তরিত হইয়াছে, তাহা কেহ স্থির করিতে পারেন নাই।

গৌড় হতশ্রী হইয়াছে সত্য, কিন্তু যতদিন তাহার শত শত মস্‌জিদের এক খণ্ড কারুকার্য্যখোদিত ইষ্টক বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন ইহার স্মৃতি বঙ্গদেশ হইতে লোপ পাইবে না। প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্যের আদর্শস্বরূপ বহু সুন্দর মস্‌জিদে বট ও অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিয়া, সেইগুলিকে ক্রমেই ধরাশায়ী করিতেছিল ; সদাশয় ইংরাজ বৃক্ষাদি কর্ত্তন করিয়া বহুব্যয়ে অনেক পতনোন্মুখ মস্‌জিদ ও মন্দিরের জীর্ণসংস্কার করিয়া সেগুলিকে রক্ষা করিয়াছেন। কেবল বঙ্গদেশের নয়, ভারতের সর্ব্বত্র এইরূপ প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের জীর্ণসংস্কার করিয়া ইংরাজরাজ তাঁহাদের সহৃদয়তা এবং প্রজারঞ্জনবৃত্তির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচার

ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয়ের ওপারে চীনদেশ ; প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য ; আমাদেরই দেশের মত শস্যশ্যামলা, বড় বড় নদী তাহার বুকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেদেশের লোকগুলা দেখিতে ঠিক আমাদের দেশের লোকের মত নহে, বেঁটে খাটো মানুষগুলি, রঙে হলুদ আভা, ছোট ছোট ফাঁকা ফাঁকা গোঁপদাড়ি—কিন্তু লোকগুলি খুব চটপটে, খুব কাজ করিতে পারে, বিশেষ করিয়া চাষের কাজ আর কাঠের কাজ। কলিকাতায় অনেক চীনা মিস্ত্রী দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাদের মত ভাল কারিগর খুব কমই আছে।

চীন অতি প্রাচীন দেশ। য়ুরোপ যখন অসভ্য, তখনও এদেশ খুব উন্নত ছিল। সে সময়ে দেশে বড় বড় পণ্ডিত শিল্পী গুণী জ্ঞানী ছিলেন। এখনও চীনারা তাঁহাদের কথা মনে করিয়া গর্ব্ব করে। সত্যই গর্ব্ব করিবার অনেক বিষয় তাহাদের আছে। চীনারাই জগতে সর্ব্বপ্রথম বারুদ প্রস্তুত, এবং কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিল। প্রথম প্রথম কাঠ কুঁদিয়া অক্ষর তৈয়ারি হইত, এবং তাহাতেই ছাপা হইত। দিক্-নির্ণয় যন্ত্র, যাহা না হইলে সমুদ্রে একটুও চলা যায় না—অসীম জলরাশির মধ্যে দিক্ ঠিক্ করিয়া জাহাজ চালান যাহা না হইলে অসম্ভব হইত—তাহাও চীনাদের আবিষ্কার।

তাহা ছাড়া যে সব বড় বড় শিল্পী সে দেশে জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের আঁকা ছবিগুলি অপূর্ব্ব। হঠাৎ দেখিলে সেগুলিকে হয়ত একটু অদ্ভুত মনে হয়, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলেই তাহাদের সৌন্দর্য্য ধরা পড়ে। চারিদিকের সুন্দর প্রকৃতিকে চীনাদের মত ভালবাসিতে খুব কম জাতিই পারিয়াছে। সেই ভালবাসার ছাপ তাহাদের ছবিতে গানে কবিতায় ছড়াইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু চীনদেশের সবচেয়ে বড় গর্ব্ব বৌদ্ধধর্ম্ম ; ভগবান্ বুদ্ধদেব আমাদেরই দেশে একদিন ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু পাথরে, শিল্পে এবং পুরান বইগুলাতে ছাড়া তাহার আর কোন চিহ্নই এখন আমাদের দেশে নাই ; খুঁজিলে এদেশে অতি অল্প বৌদ্ধই পাওয়া যাইবে। আমরা যেন বুদ্ধদেবকে এবং তাঁহার ধর্ম্মকে এদেশ হইতে একেবারেই তাড়াইয়া দিয়াছি, চীনদেশ যেন এই নির্ব্বাসিতকে ডাকিয়া ঘরে আদর করিয়া লইয়াছে। আজ সমস্ত চীনদেশের লোক বৌদ্ধ ;—আমরা বুদ্ধদেবকে ভুলিয়া গিয়াছি, আর তাহাদের দেশে আবালবৃদ্ধ সকলেই প্রতিদিন তাঁহাকে পূজা করে—তাঁহাকে স্মরণ করে।

চীনারা আমাদের এই দেশকে বুদ্ধের দেশ বলে ; ইহার আর কোন নাম তাহারা জানে না। এখনো প্রতিবৎসর কত চীনা নরনারী বুদ্ধগয়া সারনাথ প্রভৃতি এদেশের বৌদ্ধ তীর্থ-গুলিতে আসিয়া তাহাদের হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন করিয়া যায়।

কেমন করিয়া চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম প্রচার হইল আজ তাহারই কথা বলিব।

রাজপ্রাসাদের সোনার পালঙ্কে শুইয়া চীনসম্রাট্ মিংতি স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার প্রাসাদশিখরে দাঁড়াইয়া আছেন এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ। তাঁহার মুখে স্বর্গের শান্তস্নিগ্ধ দীপ্তি, অধরে প্রসন্ন হাসি, এবং অঙ্গে হলুদরঙের কাষায় বস্ত্র। মিংতির হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল।

পরদিন সকালে রাজসভায় সকলকে ডাকিয়া মিংতি স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই চুপ করিয়া রহিল। তখন এক বৃদ্ধ মন্ত্রী ধীরে ধীরে বলিলেন, "মহারাজ, যাঁহাকে আপনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন তিনি হিন্দুদের একজন মহাপুরুষ, তাঁহার নাম বুদ্ধ। তিনি জগতের দুঃখ দূর করার ব্রত লইয়া রাজার ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া পথের ভিখারী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন এবং দুঃখ দূর করার পথ তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। আপনি যখন তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছেন, বুঝিতেছি তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমরাও লাভ করিব; তাঁহার ধর্ম্ম এদেশে আসিয়া আমাদেরও দুঃখ দূর করিবার উপায় দেখাইয়া দিবে।"

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া সম্রাটের আগ্রহ হইল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের কথা শুনাইবার জন্য লোক আনিতে ভারতবর্ষের দিকে দূত পাঠাইলেন।

দূত ছুটিয়া চলিল; নদী পার হইয়া, বরফে ঢাকা

পাহাড় ডিঙ্গাইয়া, মরুভূমির দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া নানা দেশের উপর দিয়া তাহারা চলিল বুদ্ধের উপদেশ শুনাইবেন এমন লোকের সন্ধানে।

পথে দেখা দুইজনের সঙ্গে। সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া দুইজন বৌদ্ধভিক্ষু, কাশ্যপমাতঙ্গ ও তাঁহার সঙ্গী চলিয়াছেন
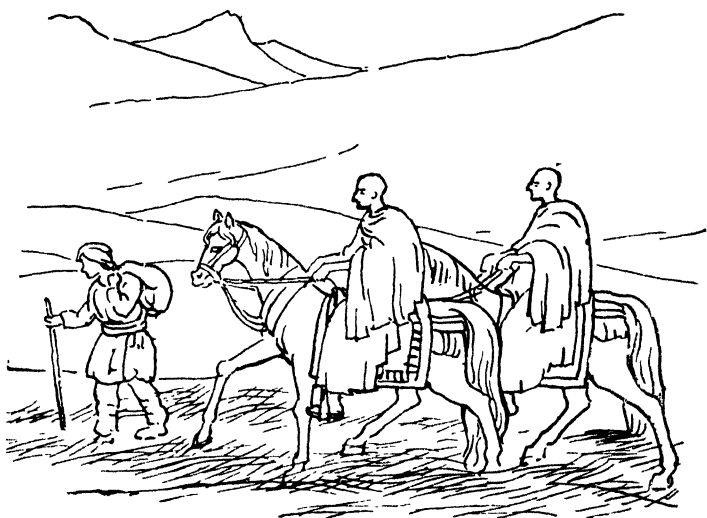
বৌদ্ধ ভিক্ষু

চীনের দিকে; ভগবান বুদ্ধের বাণী সেদেশে প্রচার করিবেন, সত্যধর্ম্মের পথ সেদেশের লোকদের দেখাইবেন, এই তাঁহাদের লক্ষ্য।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বলে ভিক্ষু; তাঁহাদের অঙ্গে হলুদ

রঙের কাষায় বস্ত্র, মাথা নেড়া, হাতে ভিক্ষাপাত্র; তাঁহারা যেখানে বাস করেন তাহাকে বলে বিহার।

এমনই করিয়া কত ভিক্ষু সমস্ত দুঃখ সহিয়া এদেশের সভ্যতা এবং ধর্ম্ম দূর দূর দেশে বহিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। আত্মীয়স্বজন পরিচিতজন ছাড়িয়া তাঁহারা গিয়াছিলেন পথের ভীষণ দুঃখ কষ্ট মাথায় পাতিয়া লইয়া, এমন দেশে, যে দেশের ভাষা, রীতিনীতি, ধর্ম্ম ও লোকজনকে কিছুই জানেন না, সকলই যেখানে অপরিচিত। সেখানে তাঁহারা কত অত্যাচার, কত দুঃখ সহ্য করিয়া, সে দেশের লোকদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া, তাহাদের ভালবাসিয়া, সেবা করিয়া, তাহাদের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, ভাষা শিখিয়া, আপনাদের ভাষার বইগুলি সে ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া, আপনাদের ধর্ম্মের কথা শুনাইয়া তাহাদের আপন করিয়াছেন; দুই জাতিকে যুদ্ধ দিয়া নহে, ভালবাসা দিয়া মিলাইয়াছেন।

কাশ্যপমাতঙ্গ ও তাঁহার সঙ্গী চীনে গেলেন। সম্রাট্ মিংতি তাঁহাদের পরম আদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন; তাঁহাদের জন্য প্রকাণ্ড বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন; তাঁহাদের সাদা ঘোড়ার কথা মনে করিয়া বিহারের নাম দিলেন "শ্বেতাশ্ববিহার"।

কাশ্যপমাতঙ্গ চীনাভাষা শিখিয়া সংস্কৃত ভাষায় লেখা অনেক বৌদ্ধধর্ম্মের বই সে ভাষায় অনুবাদ করিলেন।

চীনাভাষা শেখা যে কত শক্ত তোমরা তাহা এখন বুঝিবে না। আমাদের ভাষার মত সে ভাষায় অক্ষর নাই, অক্ষর জোড়া দিয়া কথা তৈয়ারি সে ভাষায় করা যায় না। চীনাভাষায় প্রত্যেক কথাটির জন্য পৃথক অক্ষর আছে। তাই সে ভাষা শিখিতে গেলে অন্ততঃ দুহাজার অক্ষরকে সর্ব্বদা মনে রাখা প্রয়োজন। কাশ্যপমাতঙ্গ বড় বড় সংস্কৃত বই তর্জ্জমা করিয়াছিলেন। সুতরাং ভাবিয়া দেখ কত কষ্টে তাঁহাকে চীনা ভাষা শিখিতে হইয়াছিল।

কাশ্যপমাতঙ্গ চীনাদের ভগবান বুদ্ধের কথা, তাঁহার অহিংসার এবং ধর্ম্মের কথা শুনাইলেন।

তাঁহার পরেও ভারতবর্ষ হইতে অনেকে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিই ছিলেন সর্ব্বপ্রথম।

পরিচ্ছন্নতা

পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা এক পদার্থ নয়—কিন্তু প্রায়ই এক। যে পুরুষ বা স্ত্রী বাহ্যদর্শনে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন, সে যে অন্তরেও বিশুদ্ধ এবং সুব্যবস্থিত হয় এরূপ নহে; কিন্তু যাঁহার মন বিশুদ্ধ এবং পরিপাটী, তাঁহাকে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন অবশ্যই হইতে হয়। বাহ্য ব্যাপার সমস্তকে হেয় জ্ঞান করা, আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিবারই ফল। পৃথিবী কিছুই নয়—শরীর কিছুই নয়—সংসার কিছুই নয়—এসকলের প্রতি যত্ন ও আদর করা ক্ষুদ্রাশয়তার লক্ষণ, শাস্ত্রে এরূপ কথা আছে বটে, কিন্তু দেহ এবং গৃহস্থিত সমুদয় সামগ্রী সুবিশুদ্ধ এবং সুপরিষ্কৃত রাখিবার অবশ্যকর্ত্তব্যতাও শাস্ত্রে যথোচিত পরিমাণে উল্লিখিত আছে। গৃহের এবং গৃহস্থিত দ্রব্যের যথোচিত বিলেপন ও সম্মার্জ্জনাদি, স্নান, ভোজন, আচমন, বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তন-প্রভৃতি ব্যাপার আমাদিগের অবশ্যকরণীয় প্রাত্যহিক কার্য্যের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট। বিশেষতঃ গৃহস্থের বাটীতে দেববিগ্রহ ও ঠাকুরঘর রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া সকল গৃহস্থেরই শুচিতার এবং পরিচ্ছন্নতার এক একটি আদর্শ পাইবার উপায় করা হইয়াছে। ঠাকুরঘর যেভাবে রাখ, আবাসের সকল ঘর সেই ভাবে রাখিলেই হইল। পিতা,

মাতা, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের ঘর এবং মহাগুরু স্বামীর ঘর কি ঠাকুরঘর নয় ?

বস্তুতঃ শুচিতাপ্রিয় ইহুদীদিগের মধ্যে সংক্রামক রোগ অল্প হয়। তাহার কারণ এই যে, গৃহ এবং গৃহোপকরণ সমস্ত অতি সুপরিষ্কৃত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত উহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে আদেশ আছে; এবং ইহুদীরা আপনাদের শাস্ত্রের আদেশসমস্ত ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিপালন করে। পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে সকলেই চায়, উহা ধর্ম্ম্য, স্বাস্থ্যকর এবং সাক্ষাৎ সুখপ্রদ। কিন্তু এ কথাও বলি, পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকা কিঞ্চিৎ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানব্যতিরেকে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন হওয়া সম্যক ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু পরিচ্ছন্নতা-রক্ষার নিমিত্ত নিরন্তন চেষ্টায় লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানও ঘটিয়া উঠিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। এই জন্যই পরিচ্ছন্নতাসাধনের মূলমন্ত্রগুলি, লক্ষ্মীসাধনের মূলমন্ত্র হইতে অভিন্ন। ঐ মন্ত্রের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

দ্রব্যের অপচয়, সম্পত্তিসঞ্চয়ের বিরোধী ব্যাপার। গৃহোপকরণ প্রভৃতি সম্যক্‌রূপে রক্ষা হইলেই তাহাদিগকে ছড়াইয়া রাখিবার যো নাই; যথাস্থানে যত্নপূর্ব্বক রাখিতে হয়, এবং তাহা রাখিলেই গৃহের পরিচ্ছন্নতা সম্পাদিত হয়।

সকল দ্রব্য হইতেই কোন না কোন প্রয়োজন সাধন

হইতে পারে। ছেঁড়া কাগজ, ছেঁড়া নেকড়া, কুটনার খোসা, ঘরের আবর্জ্জনা—এমন সকল পদার্থও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। ছেঁড়া কাগজ এবং ছেঁড়া নেকড়া ঘরের যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখিও না, একটি নির্দ্দিষ্ট পাত্রে রাখ; দিন কয়েকের মধ্যেই এত জমিয়া যাইবে যে, বদল দিয়া নূতন কাগজ পাইতে পারিবে। আনাজের খোসা, চাউলের ভুষি ঘরে ছড়াইয়া বাখিলে ঘর নোংরা দেখাইবে, তুলিয়া একটা কোন পাত্রে জমা কর; পোষিত গরুবাছুর-ছাগলাদির খাদ্য হইবে। ঘর ঝাঁইট দিয়া যে ধূলা এবং আবর্জ্জনা পাওয়া যায়, তাহাও জড় করিয়া ক্ষেত্রে ফেলিয়া দিলে উৎকৃষ্ট সারের কার্য্য করে। অতএব পরিচ্ছন্নতা-সাধনের একটি প্রধান সূত্র এই যে, ঐ প্রকার দ্রব্য রাখিবার পৃথক্ পৃথক্ স্থান এবং পাত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিবে এবং দ্রব্যসকল যার যে স্থান তথায় রাখিতে অভ্যাস করিবে—নিজে অভ্যাস করিবে, এবং পরিজনকেও অভ্যাস করাইবে। ঐরূপ করা এবং করান অভ্যস্ত হইলেই অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইবে, এবং ঘর-দ্বার ঝরঝরে দেখাইবে।

গৃহের দ্রব্যজাত বে-কেজো করিয়া রাখা সম্পত্তি-রক্ষা এবং সম্পত্তি-বৃদ্ধির প্রতিকূল। সুতরাং গৃহের দ্রব্যজাত যে অবস্থায় থাকিলে বে-কেজো হয়, এমন অবস্থায় রাখিতে নাই। কোন দ্রব্য ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া কি অন্যরূপে কাজের বাহির হইয়া পড়িলেই তাহাকে অবিলম্বে সারাইয়া কিম্বা

বদলাইয়া লওয়া উচিত। এই নিয়ম প্রতিপালনে অভ্যস্ত হইলে অনেক অতিরিক্ত খরচ বাঁচিয়া যায় এবং ঘরও পরিচ্ছন্ন থাকে।

গৃহ এবং গৃহস্থিত দ্রব্যাদি শীঘ্র বিনষ্ট হইতে দিলে সত্বরেই ধনক্ষয় হয়। রৌদ্র, জল, বায়ু এবং কীটাদি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিরন্তরই ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব দ্রব্যসকলকে এমন অবস্থায় রাখিবার চেষ্টা করিবে, যাহাতে ঐ প্রকার ক্ষয় যতদূর সম্ভব নিবারিত হইতে পারে। সেঁতসেঁতে না হইলে, ময়লা না ধরিলে, মরিচা না পড়িলে দ্রব্যসকল অধিক দিন টিঁকে। অতএব গৃহ এবং গৃহোপকরণ সমস্ত যাহাতে যথাপরিমাণ শুষ্ক, পরিষ্কার এবং ঝক্‌-ঝকে থাকে তাহার জন্য যত্ন করা অভ্যাস করিতে হয়। তাহা হইলেই পরিচ্ছন্নতা সাধিত হয়।

গৃহবাসী প্রাণীমাত্রকেই যে পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক, তাহা অর্থ-শাস্ত্র, শরীর-শাস্ত্র উভয় শাস্ত্রেরই অভিমত। ওবিষয়ে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই মাত্র বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব যে, গৃহপালিত জীবগণের, আপনাদিগের সন্তান-সন্ততিগণের এবং দাসদাসী প্রভৃতি পরিজনগণের পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন করিলেই সমুদায় কাজ হইল না। গৃহিণীকেও সুবেশা হইয়া থাকিতে হয়। যে গৃহিণী সর্ব্বদা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া

স্বয়ং পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জ থাকিতে চাহেন না, তাঁহার অন্তরে একটি গূঢ় অভিমান আছে—সেটি ভাল নয়; যিনি চেষ্টা করিয়াও পারেন না, তাঁহার লক্ষ্মী-চরিত্রজ্ঞান এখনও সুপক্ক হয় নাই। যিনি বাঁদী এবং বিবি উভয়ই হইতে পারেন, তিনিই লক্ষ্মী—তিনিই সম্পত্তি এবং শোভা, উভয়েরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

নক্ষত্র

রাত্রিতে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছ কি? কত হাজার হাজার নক্ষত্র আকাশকে ভরিয়া থাকে। এরা সকলেই সূর্য্য-জগতের বাহিরের জ্যোতিষ্ক। কোনোটা দপ্ দপ্ করিয়া আলো দেয়, কোনোটা মিট্‌মিট্ করিয়া করিয়া জ্বলে। তাহাদের রঙই বা কত রকমের। কোনোটার রঙ্ তারা-বাজির মত ধপ্‌ধপে সাদা, কোনোটা হল্‌দে, আবার কোনোটা লাল। আকাশের এক এক জায়গায় হয়ত বড় নক্ষত্র দেখিতে পাইবে না; সেখানকার সব নক্ষত্রই ছোট। মাঠের ওপারে কুঁড়ে ঘরটি হইতে প্রদীপে যে একটু আলো আসিতেছে, ইহাদের আলো যেন তাহার চেয়েও অল্প। আকাশের আর একদিকে চাহিয়া দেখ, সেখানে যেন বড় নক্ষত্রদের বাজার বসিয়া গিয়াছে,—ছোট নক্ষত্রদের মধ্যে অনেকগুলি বড় নক্ষত্র ডগ্ ডগ্ করিয়া জ্বলিতেছে।

উপরদিকে তাকাইয়া দেখ, সাদা জল লইয়া গঙ্গা নদীর মত যেন স্বর্গের একটা নদী আকাশের একধার হইতে আরম্ভ করিয়া মাথার উপর দিয়া আর একধারে মিশিয়াছে এবং তাহাব স্রোতে হাজার হাজার তারার ফুল ভাসিতেছে। লোকে ইহাকে ছায়া-পথ বলে। বাস্তবিকই ইহা যেন স্বর্গের পথের মত চলিয়াছে, কিন্তু

ইহাতে ছায়া নাই; দেবতাদের পায়ের স্পর্শে ইহার ধূলা মাটি সবই যেন আলোর গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। কত হাজার হাজার তারা ঐ পথের যাত্রী হইয়া পৃথিবীর দিকে মিটিমিটি চাহিতেছে, দেখিতে পাও না কি? ইহাদের সংখ্যা কত গুণিয়া ঠিক করিতে পার কি?

আকাশের আর একদিকে তাকাইয়া দেখ,—ঠিক যেন কতকগুলি জোনাকী-পোকা জড় হইয়া একটা চাক বাঁধিয়াছে এবং তাহার চঞ্চল আলো ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে; এ যেন আকাশের গলার একখানা ধুক্‌ধুকি। দূরে আকাশের গায়ে যে এক টুক্‌রা সাদা মেঘের মত দেখা যাইতেছে—তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ উহা মেঘ; কিন্তু তাহা নয়, অতি দূরের নক্ষত্রেরা ঐখানে জটলা পাকাইয়া আছে। তাই তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ দেখা যাইতেছে না; উহাদের ক্ষীণ আলো জমাট বাঁধিয়া যেন একখণ্ড মেঘের সৃষ্টি করিয়াছে। দূরবীণ দিয়া দেখিলে হাজার হাজার নক্ষত্র ঐ জায়গাতে ফুটিয়া উঠে।

আকাশের এই মূর্ত্তি কি তোমরা কখনও দেখ নাই? যদি ভাল করিয়া না দেখিয়া থাক,—যে রাত্রিতে আকাশে চাঁদ থাকিবে না, কুয়াসা, ধোঁয়া, মেঘ কিছুই থাকিবে না, তখন একবার আকাশখানিকে দেখিয়া লইয়ো; এবং সেই সময়ে মনে মনে ভাবিয়ো, এই যে অসংখ্য নক্ষত্র আকাশের গায়ে রহিয়াছে, তাহারা আলোর বিন্দু নয়,—

প্রত্যেকেই এক-একটি মহা-সূর্য্য ; আমাদের সূর্য্যের চেয়ে কেহ কেহ শতগুণ বড় এবং বহু শতগুণ বেশি তাপ ও আলো মহাকাশে ছড়ায় !

তারপরে মনে করিয়ো, এই অসংখ্য মহা-সূর্য্যের কেহই একা আকাশে থাকে না। আমাদের পৃথিবী, বৃহস্পতি, শনির মত কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গ্রহ-উপগ্রহ তাহাদের চারিদিকে ঘুরিতেছে। ইহাদের দূরত্বই বা কত। হাজার দু'হাজার লক্ষ বা কোটি মাইল দিয়া তাহা মাপা যায় না ! ইহাদের সবই যেন আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের অগোচর !

তোমরা যদি এইরকম চিন্তা করিয়া আকাশটিকে দেখিতে পার, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিবে, এই সৃষ্টিখানি কত বড় এবং যিনি এই সৃষ্টিকে শাসনে রাখিয়া চালাইতেছেন, তাঁহার শক্তিই বা কি অপরিমেয়।

দীপালির দিন আসিয়াছে ; সন্ধ্যার সময় ঘরে ঘরে শত শত দীপ জ্বলিয়াছে ; গ্রামখানি দীপে দীপে আচ্ছন্ন এবং আলোতে আলোতে ভরা ! মনে কর এমন এক রাত্রিতে তোমরা বাড়ীর ছাদে উঠিয়া আলো দেখিতেছ। এখন যদি দূরের একখানি বাড়ীর হাজার প্রদীপের মধ্যে একটি নিভিয়া যায়, তাহা হইলে তোমরা কি তাহা বুঝিতে পার ? কখনই পার না। কারণ তাহাতে আলো কমে না এবং আলোর শ্রেণীও ভাঙে না। প্রত্যেক রাত্রিতেই আকাশে

দীপালির উৎসব চলিতেছে! জ্যোতিষীরা বলেন, তাহারি কোটি কোটি প্রদীপের মধ্যে সূর্য্য একখানি ছোট প্রদীপ! সে যদি তাহার গ্রহ-উপগ্রহদের লইয়া একদিন হঠাৎ নিভিয়া যায়, তাহা হইলে এই ব্রহ্মাণ্ডের শোভা ও মহিমার একটুও ক্ষয় হইবে না এবং অপর নক্ষত্রে যদি বুদ্ধিমান প্রাণী থাকে, তাহারা হয়ত সূর্য্যের এই অপমৃত্যুর খবরটা পর্য্যন্ত জানিতে পারিবে না। অনন্ত সৃষ্টির তুলনায় আমাদের সূর্য্য কত ছোট ভাবিয়া দেখ। সেই সূর্য্যের একটি অতি ছোট গ্রহের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আমরা এক-একটি মানুষ!

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, অনন্ত মহা-সূর্য্যের মধ্যে যে-মানুষ এত ছোট এবং তুচ্ছ, সে আবার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের খবর দিবে কি করিয়া! সত্যই মানুষ অসংখ্য নক্ষত্রের খবর দিতে পারে না; তাহার বুদ্ধি, জ্ঞান, যন্ত্রতন্ত্র সৃষ্টির বিশালতা ও সীমা ঠিক করিতে গিয়া হার মানে। সে তখন স্তব্ধ হইয়া এই বিশ্বের মহিমা দেখে এবং বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশে শত শত প্রণাম করে। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমান জীব; কাজেই সে পশুদের মত আহারনিদ্রায় সব সময় কাটাইয়া দিতে পারে না; যাহা হঠাৎ বুঝিতে পারা যায় না, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করে এবং যেখানে অন্ধকার সেখানে আলো ফেলিতে চায়। এই রকমে অনন্ত আকাশের অনন্ত নক্ষত্র-লোকের অনেক টুক্‌রা-টুক্‌রা খবর মানুষ সংগ্রহ করিয়াছে।

বহুরূপী

সদিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন অবিশ্রাম বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে, এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। সকাল সকাল খাইয়া লইয়া আমরা কয় ভাই নিত্য-প্রথামত বাহিরে বৈঠক খানায় ঢালা-বিছানার উপর রেড়ির তেলের সেজ জ্বালাইয়া বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি। বাহিরের বারান্দার এক দিকে পিসেমশায় ক্যাম্বিশের খাটের উপর শুইয়া তাঁহার সান্ধ্যতন্দ্রাটুকু উপভোগ করিতেছেন, এবং অন্যদিকে বসিয়া বৃদ্ধ রামকমল ভট্‌চায আফিং খাইয়া, অন্ধকারে চোখ বুজিয়া, থেলো হুঁকায় ধূম পান করিতেছে। দেউড়িতে হিন্দুস্থানী-পেয়াদাদের তুলসীদাসী সুর শুনা যাইতেছে, এবং ভিতরে আমরা তিন ভাই মেজদা'র কঠোর তত্ত্বাবধানে নিঃশব্দে বিদ্যাভ্যাস করিতেছি। ছোড়দা,' যতীনদা,' ও আমি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি এবং গম্ভীর-প্রকৃতি মেজদা' বার-দুই এণ্ট্রান্স ফেল্ করিবার পর গভীর মনোযোগের সহিত তৃতীয় বারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার প্রচণ্ড শাসনে এক মুহূর্ত্ত কাহারও নষ্ট করিবার জো ছিল না। আমাদের পড়ার সময়

ছিল ৭৷৷০ হইতে ৯ টা। এই সময়টুকুর মধ্যে কথাবার্ত্তা কহিয়া মেজদা'র 'পাশের' পড়ার বিঘ্ন না করি, এই জন্য তিনি নিজে প্রত্যহ পড়িতে বসিয়াই কাঁচি দিয়া কাগজ কাটিয়া ২০।৩০ খানি টিকিটের মত করিতেন। তাহাতে কোনটাতে লেখা থাকিত 'বাইরে,' কোনটাতে 'থুথুফেলা,' কোনটাতে 'জল খাওয়া'। যতীনদা 'নাকঝাড়া' টিকিট লইয়া মেজদা'র সুমুখে ধরিয়া দিলেন। মেজদা' তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়া দিলেন—"হুঁ—৮টা তেত্রিশ মিনিট্ হইতে ৮টা সাড়ে চৌত্রিশ মিনিট্ পর্য্যন্ত" অর্থাৎ, এই সময়টুকুর জন্য সে নাক ঝাড়িতে যাইতে পারে। ছুটি পাইয়া যতীনদা' টিকিট্ হাতে উঠিয়া যাইতেই, ছোড়দা' 'থুথুফেলা'-টিকিট পেশ করিল। মেজদা' 'না' লিখিয়া দিলেন। কাজেই ছোড়দা,' মুখ ভারি করিয়া মিনিট্ দুই বসিয়া থাকিয়া 'তেষ্টা পাওয়া' আর্জ্জি দাখিল করিয়া দিলেন। এবার মঞ্জুর হইল। মেজদা' সই করিয়া লিখিলেন "হু—৮টা ৪১ মিনিট্ হইতে ৮টা ৪৭ মিনিট্ পর্য্যন্ত।" পরওয়ানা লইয়া ছোড়দা' হাসি-মুখে বাহির হইতেই যতীনদা' ফিরিয়া আসিয়া হাতের টিকিট দাখিল করিলেন। মেজদা' ঘড়ি দেখিয়া সময় মিলাইয়া একটা খাতা বাহির করিয়া সেই টিকিট্ গঁদ দিয়া আঁটিয়া রাখিলেন। সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম তাঁহার হাতের কাছেই মজুদ থাকিত। সপ্তাহ-পরে এই সব টিকিটের সময় ধরিয়া কৈফিয়ৎ-তলব করা হইত।

এইরূপে মেজদা'র অত্যন্ত সতর্কতায় এবং সুশৃঙ্খলায় আমাদের এবং তাঁহার নিজের কাহারও এতটুকুও সময় নষ্ট হইতে পাইত না। প্রত্যহ এই দেড়ঘণ্টাকাল অতিশয় বিদ্যাভ্যাস করিয়া রাত্রি নয়টার সময় আমরা যখন বাড়ীর ভিতরে শুইতে আসিতাম তখন মা সরস্বতী নিশ্চয়ই ঘরের চৌকাঠ পর্য্যন্ত আমাদিগকে আগাইয়া দিয়া যাইতেন; এবং পরদিন স্কুলে ক্লাসের মধ্যে যে সকল সম্মান-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ঘরে ফিরিতাম, সে ত আপনারা বুঝিতেই পারিতেছেন। কিন্তু মেজদা'র দুর্ভাগ্য তাঁহার নির্ব্বোধ পরীক্ষকগুলা তাঁহাকে কোনদিন চিনিতেই পারিল না। নিজের এবং পরের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম দায়িত্ব-বোধ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাকে বারংবার ফেল করিয়াই দিতে লাগিল। ইহাই অদৃষ্টের অন্ধ বিচার! যাক্ এখন আর সে দুঃখ জানিয়া কি হইবে!

সে রাত্রেও ঘরের বাহিরে ঐ জমাট অন্ধকার এবং বারান্দায় তন্দ্রাবিভূত সেই দুটো বুড়া। ভিতরে মৃদু দীপালোকের সম্মুখে গভীর-অধ্যয়ন-রত আমরা চারিটি প্রাণী!

ছোড়দা' ফিরিয়া আসায় তৃষ্ণায় আমার একেবারে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কাজেই টিকিট্ পেশ করিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম। মেজদা' তাঁহার সেই টিকিট-আঁটা খাতার

উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—তৃষ্ণা-পাওয়াটা আমার আইনসঙ্গত কি না, অর্থাৎ কাল পরশু কি পরিমাণে জল খাইয়াছিলাম।

আকস্মাৎ আমার ঠিক পিঠের কাছে একটা 'হুম' শব্দ; এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা' ও যতীনদা'র সমবেত আর্ত্তকণ্ঠের গগনভেদী রৈ—রৈ চীৎকার—"ওরে বাবারে খেয়ে ফেল্লেরে!" কিসে ইহাদিগকে খাইয়া ফেলিল, আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার পূর্ব্বেই, মেজদা' মুখ তুলিয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া বিদ্যুৎ-বেগে তাঁহার দুই পা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া সেজ উল্টাইয়া দিলেন। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল। মেজদা'র ছিল ফিটের ব্যামো। তিনি সেই যে 'অোঁ অোঁ' করিয়া প্রদীপ উল্টাইয়া চীৎ হইয়া পড়িলেন, আর খাড়া হইলেন না।

ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতেই দেখি, পিসেমশাই তাঁর দুই ছেলেকে বগলে করিয়া চাপিয়া ধরিয়া তাহাদের অপেক্ষাও তেজে চেঁচাইয়া বাড়ী ফাটাইয়া ফেলিতেছেন। এ যেন তিন বাপ ব্যাটার কে কত খানি হাঁ করিতে পারে, তারই লড়াই চলিতেছে।

এই সুযোগে একটা চোর নাকি ছুটিয়া পলাইতেছিল, দেউড়ীর সিপাহীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। পিসে-মশাই প্রচণ্ড চীৎকারে হুকুম দিতেছেন,—"আউর মারো—বহুত্ মার ডালো"—ইত্যাদি।

মুহূর্ত্তকালের মধ্যে আলোতে, চাকর-বাকরে ও পাশের লোকজনে উঠান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দরওয়ানরা চোরকে মারিতে মারিতে আধমারা করিয়া টানিয়া আনিয়া আলোর সম্মুখে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। তখন চোরের মুখ দেখিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল। "আরে, এ যে ভট্চায্যি মশাই!"

তখন কেহ বা জল, কেহ বা পাখার বাতাস, কেহ বা তাঁহার চোখে মুখে হাত বুলাইয়া দেয়। ও দিকে ঘরের ভিতরে মেজদা'কে লইয়া ব্যাপার!

পাখার বাতাস ও জলের ঝাপ্টা খাইয়া রামকমল প্রকৃতিস্থ হইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সবাই প্রশ্ন করিতে লাগিল, "আপনি অমন ক'রে ছুট্ছিলেন কেন?" ভট্চায্যি মশাই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "বাবা, বাঘ নয়, একটা মস্ত ভালুক—লাফ মেরে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলো।"

ছোড়দা' ও যতীনদা' বারংবার কহিতে লাগিল, "ভালুক নয়, বাবা, একটা নেকড়ে বাঘ। হুম্ ক'রে ল্যাজ গুটিয়ে পা-পোষের উপর বসেছিল।"

মেজদা'র চৈতন্য হইলে তিনি নিমীলিত চক্ষে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সংক্ষেপে কহিলেন—"দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার।"

কিন্তু কোথায় সে? মেজদা'র 'দি রয়েল বেঙ্গল'ই

হৌক, আর রামকমলের 'মস্ত ভালুক'ই হোক, সে আসিলই বা কিরূপে, গেলই বা কোথায়? এতগুলা লোক যখন দেখিয়াছে, তখন যে একটা কিছু বটেই!

তখন কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না। কিন্তু সবাই লণ্ঠন লইয়া ভয়চকিতনেত্রে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল।

অকস্মাৎ, পালোয়ান কিশোরী সিং 'উহ বয়ঠা' বলিয়াই এক লাফে একেবারে বারান্দার উপর। তারপর সেও এক ঠেলাঠেলি কাণ্ড। এতগুলা লোক, সবাই এক সঙ্গে বারন্দায় উঠিতে চায়, কাহারো মুহূর্ত্ত বিলম্ব সয় না। উঠানের এক প্রান্তে একটা ডালিম গাছ ছিল। দেখা গেল, তাহারই ঝোপের মধ্যে বসিয়া একটা বৃহৎ জানোয়ার। বাঘের মতই বটে! চক্ষের পলকে বারান্দা খালি হইয়া বৈঠকখানা ভরিয়া গেল—জনপ্রাণী আর সেখানে নাই। সেই ঘরের ভিড়ের মধ্য হইতে পিসেমশায়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আসিতে লাগিল—"সড়্কি লাও—বন্দুক লাও—।" আমাদের পাশের বাড়ীর গগনবাবুদের একটা মুঙ্গেরিগাদা বন্দুক ছিল; লক্ষ্য সেই অস্ত্রটার উপর। 'লাও'ত বটে, কিন্তু আনে কে? ডালিম গাছটা যে দরজার কাছেই; এবং তাহারই মধ্যে যে বাঘ বসিয়া! হিন্দুস্থানীরা সাড়া দেয় না,—তামাসা দেখিতে যাহারা বাড়ী ঢুকিয়াছিল, তাহারাও নিস্তব্ধ।

এমনি বিপদের সময় কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া

উপস্থিত। সে বোধ করি সুমুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল, হাঙ্গামা শুনিয়া বাড়ী ঢুকিয়াছে। নিমিষে শত কণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওরে, বাঘ! বাঘ! পালিয়ে আয়রে ছোঁড়া, পালিয়ে আয়।"

প্রথমটা সে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া এবং নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লণ্ঠন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।

দোতালার জানালা হইতে মেয়েরা রুদ্ধনিশ্বাসে এই ডাকাত ছেলেটির পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। পিসীমা ত ভয়ে কাঁদিয়াই ফেলিলেন। নীচে ভিড়ের মধ্যে গাদাগাদি দাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানী-সিপাহীরা তাহাকে সাহস দিতে লাগিল এবং এক একটা অস্ত্র পাইলেই নামিয়া আসে, এমন আভাসও দিল।

বেশ করিয়া দেখিয়া ইন্দ্র কহিল, "দ্বারিকবাবু, এ বাঘ নয়, বোধ হয়।" তাহার কথাটা শেষ হইতে না হইতেই সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার দুই থাবা জোড় করিয়া মানুষের গলায় কাঁদিয়া উঠিল। পরিষ্কার বাঙ্গালা করিয়া কহিল, "না, বাবু মশাই, না। আমি বাঘ-ভালুক নই—ছিনাথ বউরূপী।" ইন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভট্‌চার্য্যি মশাই খড়ম হাতে সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন,—"লক্ষ্মীছাড়া! তুমি ভয় দেখাবার যায়গা পাও না?"

পিসেমশায় মহাক্রোধে হুকুম দিলেন,—"কাণ পাকড়কে লাও

কিশোরী সিং তাহাকে সর্ব্বাগ্রে দেখিয়াছিল, সুতরাং তাহারই দাবী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া, সেই গিয়া তাহার কাণ ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিল। ভট্‌চার্য্যি মশায় তাহার পিঠের উপর খড়মের এক ঘা বসাইয়া দিয়া রাগের মাথায় হিন্দি বলিতে লাগিলেন,—"এই হারামজাদা বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। খোট্টা শালার ব্যাটারা আমাকে যেন কিলায়কে কাঁটাল পাকায় দিয়া—"

ছিনাথের বাড়ী করামতে, সে প্রতি বৎসর এই সময়টা একবার করিয়া রোজগার করিতে আসে। কালও এ বাড়ীতে নারদ সাজিয়া গান শুনাইয়া গিয়াছিল।

সে একবার ভট্টাচার্য্য মশায়ের, একবার পিসেমশায়ের পায়ে পড়িতে লাগিল। কহিল, ছেলেরা অমন করিয়া ভয় পাইয়া প্রদীপ উল্‌টাইয়া মহামারীকাণ্ড বাধাইয়া তোলায় সে নিজেও ভয় পাইয়া গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইয়া ছিল। ভাবিয়াছিল একটু ঠাণ্ডা হইলেই বাহির হইয়া তাহার সাজ দেখাইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর এমন হইয়া উঠিল যে, তাহার আর সাহসে কুলাইল না।

ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল; কিন্তু পিসে-মশায়ের আর রাগ পড়ে না। পিসীমা নিজে উপর

হইতে কহিলেন,—"তোমাদের ভাগ্যি ভাল যে, সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বার হয় নাই। যে বীরপুরুষ তোমরা, আর তোমার দারওয়ানরা। ছেড়ে দাও বেচারীকে, আর দূর ক'রে দাও দেউড়ীর ঐ খোট্টাগুলোকে। একটা ছোট ছেলের যা সাহস, এক বাড়ী লোকের তা' নেই?" পিসেমশাই কোন কথাই শুনিলেন না, বরং পিসীমার এই অভিযোগে চোখ পাকাইয়া—এমন একটা ভাব ধারণ করিলেন যে, ইচ্ছা করিলেই তিনি এ সকল কথার যথেষ্ট সদুত্তর দিতে পারেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের কথার উত্তর দিতে যাওয়াই পুরুষ মানুষের পক্ষে অপমানকর। তাই, আরও গরম হইয়া, হুকুম দিলেন, "উহার ল্যাজ কাটিয়া দাও।" তখন, তাহার সেই রঙিন-কাপড়-জড়ানো সুদীর্ঘ খড়ের ল্যাজ কাটিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল।

সাহিত্য-সৌরভ

পঞ্চম ভাগ

পদ্যাংশ

—··—

ভারতবর্ষ

[দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

ভারত আমার, ভারত আমার,
যেখানে মানব মেলিল নেত্র ;
মহিমার তুমি জন্ম-ভূমি মা,
এসিয়ার তুমি তীর্থ-ক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগত-জননী,
দর্শন-উপনিষদে দীক্ষা ;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প
কর্ম্ম-ভক্তি-ধর্ম্ম-শিক্ষা।

ভগবদ্‌গীতা গাহিল স্বয়ং
ভগবান্ যেই জাতির সঙ্গে,
ভগবৎ-প্রেমে নাচিল গৌর,
যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে।
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র,
প্রচার করিল নীতির মর্ম্ম ;
যাঁদের মধ্যে তরুণ-তাপস,
প্রচার করিল সোঽহং ধর্ম্ম।
আর্য্য-ঋষির অনাদি গভীর,
উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র ;
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি,
নহি কি আমরা তাদের গোত্র !
তাঁদের গরিমা-স্মৃতির বর্ম্মে,
চ'লে যাব শির করিয়া উচ্চ,
যাঁদের গরিমাময় এ অতীত,
তাঁরা কখনই নহে মা তুচ্ছ।
ভারত আমার, ভারত আমার,
সকল মহিমা হউক খর্ব্ব ;
দুঃখ কি ? যদি পাই মা তোমার
পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব্ব।
যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ
লুপ্ত হয় এ মানব-বংশ

যাদেব মহিমায় এ অতীত,
তাদের কখনও হবে না ধ্বংস।
চোখের সাম্‌নে ধরিয়া রাখিয়া,
অতীতের সেই মহা-আদর্শ ;
জাগাইব নূতন ভাবের রাজ্য
রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ !
এ দেব-ভূমির প্রতি তৃণ 'পরে,
আছে বিধাতার করুণা-দৃষ্টি,
এ মহা-জাতির মাথার উপরে
করে দেবগণ পুষ্প-বৃষ্টি !
ভারত আমার, ভারত আমার,
কে বলে তুমি মা কৃপার পাত্রী ?
ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা জননী,
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা ধাত্রী !

নগর-লক্ষ্মী

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহারবে,
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে শুধালেন জনে জনে,
ক্ষুধিতের অন্নদান-সেবা
তোমরা লইবে বল কেবা ?

শুনি' তাহা রত্নাকর শেঠ
করিয়া রহিল মাথা হেঁট।
কহিল সে কর যুড়ি' 'ক্ষুধার্ত্ত বিশাল পুরী
এর ক্ষুধা মিটাইব আমি
এমন ক্ষমতা নাই স্বামি !'

কহিল সামন্ত জয়সেন—
'যে আদেশ প্রভু করিছেন,
তাহা লইতাম শিরে যদি মোর বুক চিরে
রক্ত দিলে হ'ত কোন কাজ,
মোর ঘরে অন্ন নাই আজ !'

নিঃশ্বাসিয়া কহে ধর্ম্মপাল,
'কি কব, এমন দগ্ধ ভাল,—
আমার সোণার ক্ষেত শুষিছে অজন্মা প্রেত
রাজ-কর যোগান কঠিন;
হয়েছি অক্ষম দীনহীন।'

রহে সবে পরস্পর চাহি,
কাহার' উত্তর কিছু নাহি।
নির্ব্বাক সে সভা-ঘরে ব্যথিত নগরী 'পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যা-তারা সম রহে ফুটি!

তখন উঠিল ধীরে ধীরে
রক্ত-ভাল লাজ-নম্র শিরে
অনাথ-পিণ্ডদ-সুতা বেদনায় অশ্রুপ্লুতা
বুদ্ধের চরণ-রেণু লয়ে
মধুকণ্ঠে কহিল বিনয়ে,—

'ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া।
কাঁদে যারা খাদ্যহারা আমার সন্তান তারা;
নগরীর অন্ন বিলাবার
আমি আজি লইলাম ভার।'

বিস্ময় মানিল সবে শুনি—
'ভিক্ষু-কন্যা তুমি ভিখারিণী—
কোন্ অহঙ্কারে মাতি লইলে মস্তকে পাতি
এ হেন কঠিন গুরু-কাজ,
কি আছে তোমার কহ আজ!'

কহিল সে নমি' সবা কাছে—
'শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে!
আমি দীনহীন মেয়ে, অক্ষম সবার চেয়ে,
তাই তোমাদের পাব দয়া;
প্রভু-আজ্ঞা হইবে বিজয়া।

আমার ভাণ্ডার আছে ভরে'
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে!
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা—
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা!'

লক্ষ্মণের শক্তিশেল

[মাইকেল মধুসূদন দত্ত]

চেতন পাইয়া নাথ কহিল কাতরে,—
"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ করে, হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে, অরি-মাঝে আমি,
বিপদ-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম ? রাখিবে আজি কে, কহ আমারে ?
উঠ, বলি ! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা ? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চিরভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক, কহ শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি। কেমনে ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি,
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে !

হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ
রাখে বাঁধি' পৌলস্তেয় ! না শাস্তি' সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্‌সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি ? উঠ ভীমবাহু,
রঘুকুলজয়কেতু ! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে !
তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলী
গুণহীন ধনুঃ যথা ; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি ;
ব্যাকুল কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী ;
ব্যাকুল এ বলিদল ! উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি' !
কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতার উদ্ধারি'
অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি' রাক্ষসে।
তনয়বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এমুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর ? কি কহিব, সুধাবেন যবে
মাতা,—'কোথা রামভদ্র নয়নের মণি

আমার, অনুজ তোর ?' কি বলে, বুঝাব
উর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে ?
উঠ বৎস ! আজি কেন বিমুখ হে তুমি,
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেম'বশে,
রাজ্যভোগ ত্যজি' তুমি পশিলা কাননে ?
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন, মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা ; তিতি' এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি চাহ তুমি মোর পানে,
প্রাণাধিক ? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে !)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার ? আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতাকুলে,—দিলা কি দেবতা
এই ফল ? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি ;
শিশির-আসবে নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত ; প্রাণদান দেহ এ প্রসূন !
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু ; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে !"

আষাঢ়

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

নীল নবঘনে, আষাঢ় গগনে,
তিল ঠাঁই আর নাহিরে !
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে ।

বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর,
আউশের ক্ষেত জলে ভর ভর,
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে, দেখ চাহিরে ।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে !

ওই ডাকে শোন, ধেনু ঘন ঘন,
ধবলীরে আন গোহালে !
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে !

দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ দেখি,
মাঠে গেছে যারা, তারা ফিরেছে কি ?
রাখাল বালক কি জানি কোথায়,
সারাদিন আজি খোয়ালে !
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে !

শোন শোন ঐ পারে যাবে ব'লে
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে ?
খেয়া-পারাপার বন্ধ হ'য়েছে
আজিরে !

পূবে হাওয়া বয়, কূলে নাহি কেউ,
দুকূল বহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদরবেগে জলে পড়ি জল
ছলছল উঠে আজিরে !
খেয়া-পারাপার বন্ধ হ'য়েছে
আজিরে !

ওগো আজ তোরা যাস্‌নে গো তোরা
যাস্‌নে ঘরের বাহিরে
আকাশ আঁধার, বেলা বেশী আর
নাহিরে !

ঝরঝরধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হ'য়েছে পিছল,
ওই বেণুবন দুলে ঘন ঘন !
পথ-পাশে দেখ চাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে

ছেলের দল

[সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

হল্লা ক'রে ছুটির পরে ওই যে যারা যাচ্ছে পথে,—
হাল্কা হাসি হাস্‌ছে কেবল,—ভাসছে যেন আল্‌গা স্রোতে,—
কেউবা শিষ্ট, কেউবা চপল, কেউবা উগ্র, কেউবা মিঠে ;
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ভাব্‌না যা' সে ওদের পিঠে।
ওই আমাদের চোখের মণি,—ওই আমাদের বুকের বল,—
ওই আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল,—
ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্য ফল,—
আদর্শে যে সত্য মানে,—সে ওই মোদের ছেলের দল।

ওরাই ভাল বাস্‌তে জানে
দরদ দিয়ে সরল প্রাণে,

প্রাণের হাসি হাস্‌তে জানে, খুল্‌তে জানে মনের কল,—
ওই যে দুষ্টু, ওই যে চপল,—ওই আমাদের ছেলের দল

ওরাই রাখে জ্বালিয়ে শিখা বিশ্ব-বিদ্যা-শিক্ষালয়ে,
অন্নহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হ'য়ে ;
পুরাতনে শ্রদ্ধা রাখে নূতনেরও আদর জানে
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—নেইক দ্বিধা ওদের প্রাণে ;
ওই আমাদের ছেলেরা সব—ঘুচিয়ে অগৌরবের রব
দেশদেশান্তে ছুট্‌ছে আজি আন্‌তে দেশে জ্ঞান-বিভব ;

মার্কিনে আর জর্ম্মনিতে পাচ্ছে তারা তপের ফল,
হিবাচীতে আগুন জ্বেলে শিখ্ছে ওরা কজাকল ;
হোমের শিখা ওরাই জ্বালে,
জ্ঞানের টীকা ওদের ভালে,
সকল দেশে সকল কালে উৎসাহ-তেজ অচঞ্চল,
ওই আমাদের আশার প্রদীপ, ওই আমাদের ছেলের দল।

মানুষ হ'য়ে ওরা সবাই অমানুষী শক্তি ধরে,
যুগের আগে এগিয়ে চলে, হাস্যমুখে গর্ব্বভরে ;
প্রয়োজনের ওজন-মত আয়োজন সে কর্ত্তে পারে,
ভগবানের আশীর্ব্বাদে বইতে পারে সকল ভারে।
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ত্রুটি ওদের অনেক হয়,—
মাঝে মাঝে ভুল ঘটে ঢের,—কারণ ওরা দেবতা নয় ;
মাঝে মাঝে দাঁড়ায় বেঁকে নিন্দা শুনে অনর্গল,
প্রশংসাতেও হয় গো কাবু,—মনের মতন দেয় না ফল ;
তবু ওরাই আশার খনি,—
সবার আগে ওদের গণি,
পদ্মকোষের বজ্রমণি ওরাই ধ্রুব সুমঙ্গল ;
আলাদিনের মায়ার প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল।

সন্তানক

[যতীন্দ্রমোহন বাগচী]

সেদিন সাঁঝে ছিল না কাজ হাতে
জানালা-পথে বাহিরে ছিনু চেয়ে ;
প্রাঙ্গনেতে মালীর ছেলের সাথে
খেলিতেছে আমার ছোট মেয়ে।

দুইটি সাথী—বয়স প্রায় সমান,
ঐ টুকুনই দুটির মাঝে মেলে ;
তফাৎ সবি, হয় না দিতে প্রমাণ—
আমার মেয়ে—আর সে মালীর ছেলে !

হোক্‌গে যাক্ খেলা বইত নয়,
অন্যলোকে জান্‌বে বা কি করে ?
সন্ধ্যা হ'লেই ভাঙ্গবে পরিচয়,
মালীর ছেলে ফিরবে তাদের ঘরে।

কিন্তু দেখি এওতো লাগে বেশ—
দুটি যেন আপন ভায়ে-বোনে
খেলায় মেতে, নাইক ভেদ-লেশ—
সকল ভুলে খেলে আপন মনে !

ভালবেসে এ ওর ঘাড়ে চড়ে,
মধুর হেসে ও এরে টানে কোলে,
ইহার কেশে ঘাসের মালা পড়ে,
বক্ষদেশে উহার হার দোলে !

বড় মধুর শিশুর ছেলেখেলা—
বড় মধুর চাঁদ মুখের হাসি !
কেন ফুরায় এমন সুখের বেলা—
কেন শুকায় এমন ফুলের রাশি ?

চাইতে চক্ষু আর্দ্র হ'য়ে আসে—
কে মিলালে অমিলের এই মিল !
ধনীর ছেলে গরীব ভালবাসে,
কে খুলিল অসম্ভবের খিল ?

একি ! আবার মারামারি একি ?
ওকি ! আমার খুকীর গায়ে লাথি
সে আপনার আমি চেয়ে দেখি—
খেলিস্ ব'লে তুই তাহার সাথী ?

বিষম রেগে ডাকিয়া দরোয়ানে,
হুকুম দিনু ধরিয়া আন্ ওরে ;
নিমেষ মাঝে বাঁধিয়া তা'রে আনে—
দাঁড়াল আসি মুখটি নীচু করে'

চাবুক নিয়ে মারিতে গেনু যেই,
 খুকী—সে আসি আছাড়ি' পড়ি' পায়ে
কহিল কাঁদি—উহার দোষ নেই,
 আমিই আগে মেরেছি ওর গায়ে।

ভুলিনু রোষ কন্যাপানে চেয়ে
 স্বর্গ যেন উঠিল ফুটি চোখে!
অশ্রু এল নয়ন পরে ছেয়ে—
 বাক্যহীন রহিল যত লোকে।

নিমেষে ভুলি মান ও অপমান,
 দুজনে টানি নিলাম দুই কোলে—
আমারই চোখে চাহিল ভগবান
 আমারই বুকে 'সন্তানক' দোলে।

দুই বিঘা জমি

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবি গেছে ঋণে,
বাবু বলিলেন, "বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।"
কহিলাম আমি, "তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই ;—
চেয়ে দেখ মোর আছে বড় জোর মরিবার মত ঠাঁই।"
শুনি রাজা কহে, "বাপু, জান ত হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা,
ওটা দিতে হবে।"—কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজল চক্ষে, "করুন রক্ষে গরীবের ভিটা খানি !
সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোণার বাড়া
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া !"
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে !"

পরে মাস দেড়ে ভিটে-মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে,
করিল ডিক্রি সকলি বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে, হায় ! সেই বেশী চায়, আছে যার ভূরি ভূরি ;
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি !

মনে ভাবিলাম, মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্ত্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্ব-নিখিল দু'বিঘার পরিবর্ত্তে।

সন্ন্যাসী-বেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য,
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য।
ভূধরে, সাগরে, বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি,
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারিনে সেই দুই বিঘা জমি!
হাটে মাঠে ঘাটে এই মত কাটে বছর পনেরো ষোলো,
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়ই বাসনা হলো।

নমোনমোনমঃ সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি—!
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি!
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমে তব পদ-ধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন, রাখালের খেলাগেহ—
স্তব্ধ অতল দীঘি কালোজল, নিশীথ-শীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে,—
মা বলিতে প্রাণ করে আন্-চান্ চোখে আসে জল ভ'রে।

দুইদিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে,
কুমোরের বাড়ী দক্ষিণে ছাড়ি, রথতলা করি বামে,
ছাড়ি হাটখোলা নন্দীর গোলা মন্দির করি পাছে,
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ীর কাছে।

বিদীর্ণ হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারিদিকে চেয়ে দেখি,
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে, সেই আম গাছ, এ কি
বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালক কালের কথা।

সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম,
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর পাঠশালা পলায়ন—
ভাবিলাম হায়, আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন!
সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস, শাখা দুলাইয়া গাছে,
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।
ভাবিলাম মনে, বুঝি এতক্ষণে আমারে চিনিলা মাতা
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।

হেনকালে হায় যমদূত-প্রায় কোথা হতে এল মালী,
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে, সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি!
কহিলাম তবে, "আমি ত নীরবে দিয়েছি আমার সব,
দুই ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব!"
চিনিল না মোরে লয়ে গেলে ধ'রে কাঁধে তুলি লাঠি গাছ,
বাবু ছিপ্ হাতে পারিষদ-সাথে ধরিতে ছিলেন মাছ।

শুনি বিবরণ ক্রোধে তিন কন,—"মারিয়া করিব খুন!"
বাবু যত বলে, পারিষদদলে বলে তার শতগুণ।

আমি কহিলাম, "শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয়!"
বাবু কহে হেসে, "বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।"
আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে,
তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!

হিমালয়াষ্টক

[সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

নম নম হিমালয়!
গিরিরাজ—তুমি, মানচিত্রের মসীর চিহ্ন নয়!
বর্ষা-মেঘের মত গম্ভীর!
দিগ্‌বারণের বিপুল শরীর!
অবাধ বাতাস বাধ্য তোমার, তোমারে সে করে ভয়।
নম নম হিমালয়!

নম নম গিরিরাজ!
অযুত ঝোরার মুক্তা-ঝুরিতে উজ্জ্বল তব সাজ;
সূত্রবিহীন কুসুমের হার
উল্লাসে শোভে উরসে তোমার;
মৃদু-পর্ণিকা করিছে অঙ্গে পত্র-রচনা কাজ!
নম নম গিরিরাজ!

নম মহামহীয়ান্ !
নতশিরে যত গিরি-সামন্ত সম্মান করে দান।
গুহার গূঢ়তা, ভৃগুর ভ্রূকুটি,
তোমাতে রয়েছে পাশাপাশি ফুটি',
ভীম অর্ব্বুদ, ভীষণ তুষার গাহিছে প্রলয় গান !
নম মহামহীয়ান্ !

নম নম গিরিবর !
স্থির-তরঙ্গ-ভঙ্গিমাময় দ্বিতীয় রত্নাকর !
শিখরে শিখরে, শিলায় শিলায়,—
চপল-চমরী-পুচ্ছ-লীলায়,—
সাগর-ফেনের মত সাদা মেঘ নাচিছে নিরন্তর।
নম নম গিবিবর।

নম নম হিমবান্ !
মৌনে শুনিছ বিশ্ব-জনের তুখ-সুখের গান ;
নিখিল জীবের মঙ্গল-ভার
নিজ মস্তকে বহ অনিবার,
চির-অক্ষয় তুষার তোমার শত চূড়ে শোভামান ;
নম নম হিমবান্।

নম নম ধরাধর !
নাগ বেণী আর সরল শালেতে মণ্ডিত কলেবর ;

মেঘ উত্তরী,' তুষার কিরীট,
ছত্র আকাশ, ধরা পাদপীঠ ;
তুমি লভিয়াছ মৃত্যু-ভুবনে চির-অমরতা-বর !
নম নম ধরাধর ।

নম নম হিমাচল !
কত তপস্বী তব আশ্রয়ে পেয়েছে কাম্য ফল ;
মোরে দেছ তুমি নব আনন্দ,—
মহামহিমার বিশাল ছন্দ
তোমারে হেরিয়া পরাণ ভরিয়া উছলিছে অবিরল !
নম নম হিমাচল ।

অতীত-সাক্ষী নম !
ক্ষুদ্র করিয়া ক্ষীণ কল্পনা অক্ষম ভাষা ক্ষম ;
বাল্মীকি যার বন্দনা গান,
কালিদাস যার অন্ত না পান,—
সেই মহিমার ছবি আঁকিবার দুরাশা ক্ষম হে মম ;
বিশ্ব-পূজিত নম ।

সিদ্ধার্থের দয়া

[নবীনচন্দ্র সেন]

একদিন নিরজনে মনোহর পুরোদ্যানে
সিদ্ধার্থ ভাবিতেছিলা বসি' অন্যমন
শুক্লমেঘ খণ্ড মত রাজহংস শত শত
আনন্দ লহরী-পূর্ণ করিয়া গগন
যাইছে ভাসিয়া সুখে. হঠাৎ আহত বুকে,
একটি কুমার-অঙ্কে হইল পতন।
উদ্ধার করিতে শরে লাগিল কোমল করে,
কুমার বেদনা এই বুঝিল প্রথম,
অধীর হইল, প্রাণ. বহিল প্রথম এই
বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্য প্রস্রবণ।
করুণার অশ্রুজলে, করুণার পরশনে,
হইল বিগত ব্যথা, বাঁচিল মরাল।
কুমার লইয়া বুকে, মুগ্ধা জননীর মত,
চাহি' ক্ষুদ্র মুখ পানে রহে কিছুকাল।
কি মহিমা করুণার ! কাননের বিহঙ্গেও
বুঝে তাহা, কি মধুর করে প্রতিদান !
উভয়ে উভয় পানে নীরবে চাহিয়া কিবা,
করুণায় উভয়ে বিমোহিত প্রাণ !

আসি' দেবদত্ত কহে,— "কুমার, এ হংস মম ;
মম শরে হ'য়ে হত পড়েছে ভূতলে।"
কুমার বলিল ধীরে,— "হতজীব, হত্যাকারী
পায় যদি, ভাই, কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্র-বলে,
যে দেয় জীবন তা'রে সে কি তারে পাইবে না ?
হত নহে এই হংস আহত কেবল।
আঘাতের ব্যথা ভাই ! আজি বুঝিয়াছি আমি,
হংসের ব্যথায় প্রাণ হয়েছে বিকল !
তোমারো ত আছে প্রাণ ; পাখীটির ক্ষুদ্র প্রাণে,
বুঝ নাকি, কি যে ব্যথা পেয়েছে বিষম ?
লও তুমি শাক্য-রাজ্য, আমি নাহি চাহি তাহা ;
এ হংস আমার, আমি দিব না কখন।"
শাক্য-পুত্র দেবদত্ত, স্তম্ভিত বিস্মিত চিত্ত,
দেখিল—কুমার নহে, মূর্ত্তি করুণার !
ফিরিল নীরবে গৃহে ; উড়িল মরাল সুখে,
কলকণ্ঠে এ করুণা করিয়া প্রচার।

দধীচির তনুত্যাগ

[হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

নগেন্দ্র অঞ্চলে, যেথা নগেন্দ্র-নন্দিনী
তটিনী অলকনন্দা কলকল স্বরে
বহিছে, কানন-দেশ ধীরে প্রক্ষালিয়া,
দিনমণি অস্তগতে উরিলা সুরেশ,
ছাড়িয়া আকাশপথ।
উঠি তপোধন
শিষ্যগণসহ মুখে অতিথি সম্ভাষি,
যোগাইলা মৃগচর্ম্ম পবিত্র আসন ;
জিজ্ঞাসিলা সুমধুর বিনীত বচনে
'আশ্রমে কি হেতু গতি ? অপরূপ !'
ভগ্ন-চিত্ত দেবরাজ নেহারি, নির্ম্মল
কৃপালু ঋষির মুখ, নিস্পন্দ—নির্ব্বাক্ !
হেরি ঋষি, ক্ষণকালে ধ্যানেতে জানিলা
অতিথির অভিলাষ ; গদগদ স্বরে
মহানন্দে তপোধন কহিলা তখন,
"সুররাজ শচীকান্ত ! কি সৌভাগ্য মম
জীবন সার্থক আজি পবিত্র আশ্রম !

এ জীর্ণ পঞ্জর অস্থি পঞ্চভূত ছায়
না হ'য়ে, দেবের কার্য্যে নিয়োজিত আজি !
হে দেব ! এ ভাগ্য মম স্বপ্নেরো অতীত ।"
কহিলা ধীমান্ পুনঃ—ললিত দৃষ্টিতে
চাহি শিষ্য-কুল-মুখ, মধুর সম্ভাষে
"ওহে বৎসগণ ! এ হেন সৌভাগ্যে মম
কর কেন অশ্রুপাত ? এ ভব-মণ্ডলে
পর-হিতে প্রাণ দিতে পারে কয় জন ?
হিত-ব্রত সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা ?
হায় রে, অবোধ প্রাণি, নশ্বর এ দেহ
না ত্যজিলে পর-হিতে কিসে নিয়োজিবে ?
হে ক্ষুব্ধ তাপসগণ ! হে শিষ্যমণ্ডলী !
জগৎ-কল্যাণ-হেতু নরের সৃজন :
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্ম পালনে ?
উহাই মোক্ষের পথ এ জগতীতলে ।"
ঋষিবৃন্দে আলিঙ্গন দিলা, এত বলি
আশীষিলা শিষ্যগণে । কহিলা বাসবে,—
"হে দেবেন্দ্র ! কৃপা করি অন্তিমে আমায়
কর শুচি, দেহ মম বারেক পরশি ।"

অগ্রসরি শচীপতি সহস্রলোচন,—
তপোধন-শির স্পর্শি সুকর-কমলে,
কহিলা আকুল-স্বরে "এ ভবমণ্ডলে

সাধু-শিরোরত্ন ঋষি তুমিই সাত্ত্বিক !
তুমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন।
তুমিই সাধিলা ব্রত এ জগতী-তলে
চির-মোক্ষ-ফলপ্রদ—নিত্য-হিতকর।
কর্ত্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ পরিহার,
জীবের কল্যাণে রত থাকা অনুদিন !
পরহিত ব্রত ঋষি ধর্ম্ম যে পরম
তুমিই বুঝিয়াছিলে, উদ্‌যাপিলে আজ
কি বর অর্পিব আমি নিষ্কাম তাপস !
না চাহিলা কোন বর ; এ সুকীর্ত্তি ত
প্রাতঃস্মরণীয় হবে নিত্য নরকুলে।
তব বংশে জনমি মহর্ষি বেদব্যাস—
করিবে জগতে খ্যাত এ আশ্রম তব—
পুণ্য বদরিকাশ্রম পুণ্য ভূমি মাঝে।”

আরম্ভিল তার-স্বরে চতুর্ব্বেদ-গান
উচ্চে হরি-সংকীর্ত্তন মধুর গম্ভীর—
বাষ্পাকুল ঋষিগণ—ধ্যানে মগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে !
দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিশ্বাসশূন্য নিস্পন্দ সে দেহ,

বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি,
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শূন্যে উঠি,
মিলাইয়া শূন্য দেশে ; বাজিল গম্ভীরে
পাঞ্চজন্য—হরি-শঙ্খ ; শূন্য দেশ যুড়ি
পুষ্পাসার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি !
দধীচি ত্যাজিলা তনু দেবের মঙ্গলে !

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

[মাইকেল মধুসূদন দত্ত]

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু !—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহাপর্ব্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ-চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে !—
দানে বারি নদীরূপা বিমল কিঙ্করী
যোগায় অমৃত-ফল পরম আদরে
দীর্ঘশিরঃ তরুদল দাসরূপ ধরি,
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে
দিবসে শীতল-শ্বাসী ছায়া বনেশ্বরী
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে!

রাম-বিলাপ

[কৃত্তিবাস]

হাতে ধনুর্ব্বাণ রাম আইসেন ঘরে,
পথে অমঙ্গল যত দেখেন গোচরে !
বামে সর্প দেখিলেন, শৃগাল দক্ষিণে !
তোলা-পাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে।
বিপরীত ধ্বনি করিলেক নিশাচর,
লক্ষ্মণ আইসে পাছে শূন্য রাখি ঘব !
মারীচের আহ্বানে কি লক্ষ্মণ ভুলিবে ?
সীতারে রাখিয়া একা অন্যত্র যাইবে ?
দুঃখের উপরে দুঃখ দিবে কি বিধাতা,
যা ছিল কপালে তাহা দিলেন বিমাতা।
বলেন শ্রীরাম, "শুন সকল দেবতা,
আজিকার দিনে মোর রক্ষা কর সীতা।"
যেমন চিন্তেন রাম, ঘটিল তেমন,
আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি,
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন সীতাজানি ;—
"কেন ভাই, আসিতেছ তুমি যে একাকী,
একাকিনী শূন্যঘরে রাখিয়া জানকী,

আইলাম তোমারে করিয়া সমর্পণ,
কোথায় রাখিয়া এলে মম স্থাপ্যধন ?
মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই,
আর বুঝি জানকীর সাক্ষাৎ না পাই।
শুন রে লক্ষ্মণ, সেই সোণার পুতলী,
শূন্য ঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি ?
দুরন্ত দণ্ডকারণ্য মহাভয়ঙ্কর,
হিংস্র জন্তু কত শত, কত নিশাচর,
কোন্ দণ্ডে কোন্ দুষ্টে পাড়ে বা প্রমাদ,
কি জানি রাক্ষসগণে সাধিল বা বাদ।
এই বন দুষ্ট রাক্ষসের থানা,
পূর্ব্বাপর লক্ষ্মণ, তোমার আছে জানা।
আমার অধিক, ভাই, তব বুদ্ধিবল,
ভাগ্য-দোষে হেন বুদ্ধি গেল রসাতল।"
এই মতে কহিতে কহিতে দুই ভাই,
বায়ুবেগে চলিলেন, অন্য জ্ঞান নাই।
উপনীত হইলেন, কুটীরের দ্বার,
সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন বারে বার।
শূন্যঘর দেখেন, না দেখেন জানকী,
মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন শ্রীরাম ধানুকী।
শ্রীরাম বলেন, "ভাই, এ কি চমৎকার!
সীতা বিনা সকলি যে দেখি অন্ধকার।

তখনি বলিনু, ভাই, সীতা নাই ঘরে,
শূন্যঘর পাইয়া হরিল কোন্ চোরে।”
প্রতি বন, প্রতি স্থান, প্রতি তরুমূল,
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল !
এইরূপে একস্থানে যান শতবার,
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার !
কাঁদিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি,
রামের ক্রন্দনে কাঁদে বন্য পশু পাখী।
রামের আশ্রমে আসি যত মুনিগণ,
নানা মতে কহে সবে প্রবোধ-বচন।
শোকেতে অধীর, শান্ত না হন শ্রীরাম,
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম।
সীতা সীতা বলিয়া পড়েন ভূমিতলে,
করেন লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামেরে কোলে।
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে ;—
“ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে।
কি করিব, কোথা যাব, অনুজ লক্ষ্মণ,
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ।
বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায়,
গেলেন জানকী, নাহি জানায়ে আমায়।
গোদাবরী-নীরে আছে কমল-কানন,
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ ?

পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া ?
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস,
চন্দ্রকলা-ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস ?
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা,
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা ?
রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে,
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে।
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারালাম বনে,
কেকয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে।
সৌদামিনী কেমন লুকায় জলধরে,
লুকাইল তেমনি জানকী বনান্তরে।
কনকলতার প্রায় জনকদুহিতা,
বনে ছিল, কে করিল তারে উৎপাটিতা ?
দিবাকর, নিশাকর, দীপ, তারাগণ,
দিবানিশি করিতেছে তমঃ নিবারণ।
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার ;
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার!
দশ দিক্ শূন্য দেখি সীতা-অদর্শনে,
সীতা বিনা কিছু নাহি লয় মম মনে।
সীতা ধ্যান, সীতা জ্ঞান, সীতা চিন্তামণি,
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী!

দেখ রে লক্ষ্মণ ভাই, কর অন্বেষণ,
সীতারে আনিয়া দেহ, বাঁচাও জীবন।
আমি জানি, পঞ্চবটি, তুমি পুণ্য-স্থান,
তেঁই সে এখানে করিলাম অবস্থান ;
তাহার উচিত ফল দিলা যে আমারে,
শূন্য দেখি তপোবন, সীতা নাই ঘরে।
শুন পশু মৃগ, পক্ষী, শুন বৃক্ষ লতা,
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা ?”
কান্দিয়া, কান্দিয়া রাম ভ্রমেন কানন,
দেখিলেন পথমধ্যে সীতার ভূষণ।
দেখিলেন প’ড়ে আছে ভগ্ন রথ-চাকা,
কনক রচিত আছে পতিত পতাকা।
রথ-চূড়া পড়িয়াছে আর তার জাঠি,
মণি, মুক্তা, পড়িয়াছে সুবর্ণের কাঁঠি।
শ্রীরাম বলেন, “দেখ, ভাইরে লক্ষ্মণ ;
এইখানে সীতার করহ অন্বেষণ।
মহা যুদ্ধ হইয়াছে করি অনুমান,
লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ তার দেখ বিদ্যমান।”
ক্ষণেক উঠেন রাম, বৈসেন ক্ষণেক,
যেমন উন্মত্ত, রাম, বলেন অনেক।
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে করেন উদ্দেশ,
বনে বনে ভ্রমিয়া অনেক পান ক্লেশ।

এইরূপে শ্রীরাম ভ্রমেন চারিদিকে,
রক্তে রাঙ্গা জটায়ুকে দেখেন সম্মুখে।
কাতর জটায়ু অতি, হেরি রঘুবীরে,
মুখে রক্ত উঠে, বীর বলে ধীরে ধীরে।
"অন্বেষিয়া সীতারে, পাইলে বহু ক্লেশ,
কিন্তু হেথা সীতার না পাইবে উদ্দেশ।
সীতার লাগিয়া, রাম, আমার মরণ,
সীতাকে লইয়া গেল লঙ্কার রাবণ।
দুই-ভাই তোমরা না ছিলা যবে ঘর,
শূন্য ঘর পাইয়া হরিল লঙ্কেশ্বর।
আমি বৃদ্ধ, যুদ্ধ করি, রুদ্ধ করি তায়,
রাখিয়াছিলাম, রাম, তোমার আশায়।
দুই পাখা কাটিলেক পাপিষ্ঠ রাবণ,
মুখে রক্ত উঠে, রাম, যায় এ জীবন।
প্রাণ আছে তোমারে করিতে দরশন,
সম্মুখে দাঁড়াও, রাম, দেখি একক্ষণ।
তব পাদোদক, রাম, দেহ মোর মুখে,
সকল কলুষ নাশি যাই পরলোকে।"
এত বলি বন্দে পক্ষী শ্রীরাম, লক্ষ্মণ,
দিব্য রথে চাপি স্বর্গে করয়ে গমন।

কাঙালিনী

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

আনন্দময়ীর আগমনে,
আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে !
হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশী
কানে তাই পশিতেছে আসি',
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
দুরাশার সুখের স্বপন ;
চারিদিকে প্রভাতের আলো
নয়নে লেগেছে বড় ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনক তপন।
কত কে যে আসে, কত যায়,
কেহ হাসে, কেহ গান গায়,
কত বরণের বেশভূষা—
ঝলকিছে কাঞ্চন-রতন,—
কত পরিজন দাস দাসী,
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি,

চোখের উপর পড়িতেছে
মরীচিকা-ছবির মতন !
হেরি তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে।
শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে ;
মা'র মায়া পায়নি কখনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে !
তাই বুঝি আঁখি ছল ছল,
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা ।
চেয়ে যেন মা'র মুখপানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে,—"মাগো, এ কেমন ধারা ?
এত বাঁশী, এত হাসিরাশি,
এত তোর রতন-ভূষণ,
তুই যদি আমার জননী,
মোর কেন মলিন বসন ?"
ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি
ভাই বোন্ করি' গলাগলি,
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই ;
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে,
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,

ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়ে—
"আমি ত ওদের কেহ নই !
স্নেহ ক'রে আমার জননী
পরা'য়ে ত দেয় নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে ক'রে নিয়ে
মুছায়ে ত দেয় নি নয়ন।"
আপনার ভাই নাই বলে'
ওরে কিরে ডাকিবে না কেহ ?
আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কিরে করিবে না স্নেহ !
ও কি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে রবে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে !
অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহীনা মা যদি না পায়
ওরে আজ কিসের উৎসব !
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল-কলস।